রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্ব : একটি দার্শনিক বীক্ষা

পি.এইচ.ডি (কলা শাখা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ-এর সারসংক্ষেপ

গবেষক :

পম্পা রায়

তত্ত্বাবধায়ক :

ঝুমা চক্রবর্তী

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২২

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্র উদ্বৃত্ত তত্ত্ব

আমরা প্রায় প্রত্যেকেই এ বিষয়ে অবগত যে, রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, প্রত্যেক মানুষের জীবনে এক সত্যের বোধ অর্জন করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র এই সত্যের বোধ অর্জন করাই নয়, তা অর্জন করে জগতে কর্মের মাধ্যমে সেই সত্য হয়ে ওঠাতেই জীবনের পূর্ণতা। জগৎকে আংশিকরূপে জেনে এবং আপন সত্য থেকে দূরে অবস্থান করে জীবনের আংশিক সত্যকে পূর্ণ সত্য রূপে দাবী করা যায় না। তাই মানব সত্যের পূর্ণতা উপলব্ধ করতে হলে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে যে উদ্বৃত্ত আছে তার জ্ঞান প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে যে বিশ্বরূপের কথা বলেছেন তার মধ্যে উদ্বৃত্তের আভাস রয়েছে। উদ্বৃত্তের সৃজনীশক্তির দ্বারা মানুষ অসীমের সন্ধান করে। উদ্বৃত্তের শক্তি দ্বারাই মানুষের ইচ্ছা ও ভাবনা ছাপিয়ে যায় তৎকালীন দেশ-কালের সীমানা। মানবদেহ যে শুধুমাত্র মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, হৃদয়-এর ধারনকারী নয় সেকথা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করেছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন :-

"It has colour, shape and movement, most of which belong to the superfluous, that are needed only for self-expression and not for self-preservation."[১]

যুগ যুগ ধরে মানুষ আপন ব্যক্তিত্ব প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছে। আর এই সাধনায় মানুষ নিজেকেই প্রকাশ করেছে। এই আত্মপ্রকাশ এক ক্রমশ বৃহৎ সামঞ্জস্য (Hermony) লাভের প্রচেষ্টা। মানুষ নিজস্ব কোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে অর্ন্তনিহিত সৃজনীশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য (Hermony) লাভ করে এবং সেই সামঞ্জস্য সৃষ্ট ধারনার দ্বারা অন্য মানুষ, জগত এবং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের মতে, আত্মবোধ থেকে বিশ্ববোধে, স্বার্থ থেকে পরমার্থে উত্তীর্ণ হওয়াই মানুষের ধর্ম। মানুষের অন্তর্নিহিত

---

[১] Tagore, Rabindranath, Ghosh, Sisir Kumar (ed.), Angel of Surplus, Visva Bharati, 2010, P. 36.

সৃজনীশক্তির উদ্বৃত্তই এই প্রকার প্রবণতার কারন। এর দ্বারা মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে। মানুষ যেন উদ্বৃত্তের পরী (Angel of Surplus)।

মানুষের রুপ, চারিত্রিক মহিমা, সংগীত, সাহিত্য, নৃত্যকলা, শিল্পকলা, দর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে যে উৎকর্ষের প্রকাশ ঘটে তা বারবার প্রমান করে যে, মানুষের অন্তর অসীম অনন্ত সত্তার সন্ধান করে। মানবজীবনে উদ্বৃত্তের স্বরূপটি হল তাই যা তাকে তৎকালীন অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না। তাই মানুষ সৃষ্টিশীল হয়। সৃষ্টির মাধ্যমে উপলব্ধি করে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পরিচয় তার সত্য পরিচয় নয়। বিশ্বগত আত্মপরিচয় তার সত্য পরিচয়। এই বিশ্বগত আত্মপরিচয়ের আকুলতা আসে মানুষের অন্তরের উদ্বৃত্ত থেকে।

মানুষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে কর্মগুলি করে, তার প্রেরণা এসেছে আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার তাগিদ থেকে। নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার আকাঙ্খা থেকে মানুষ অনন্তকে জানতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা লাভের উদ্দেশ্যেই মানুষ সৃজনশীল কর্ম করে। আপন সীমা পার করে আনন্দ লাভ করে, যা তার প্রেমে, সৌন্দর্য্যে ও মহত্ত্বে বিদ্যমান।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "This crossing of the limit produces joy, the joy that we have in beauty, in love, in greatness. Self-forgetting, and, in a higher degree self- sacrifice, is our acknowledgement of this our experience of the infinite. This is the philosophy which explains our joy of in all arts, ..."[২]

মানুষ বিশ্বাস করে যে, আপনাকে বৃহতে উপলব্ধি করাই সত্য। অহংসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা অসত্য। নিজ আত্মার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে মানুষ আনন্দ লাভ করে। নিজেকে প্রকাশ করে আনন্দ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নিজেকে না জানাকে এক প্রকার বন্ধন বলেই মনে করেন।

---

[২] Ibid, P.37

"আপনারে জানে না যে,
সেই তার হয়েছে বন্ধন।"[৩]

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বিবর্তনের ধারায় মনুষ্য জগৎ পশুর জগৎ থেকে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক রূপ নিয়েছে। মানুষ চতুষ্পদী ভঙ্গীমায় জীবন পরিত্যাগ করে দু পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়েছে। বিবর্তনের ধারায় ব্যতিক্রম ঘটায় মানুষ। মানুষ দৈহিক ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও দু'পায়ে ভর করে দাড়িয়েছে। পশুর মতো চারপায়ে নিচের দিকে ঝুঁকে জগৎকে দেখার চিরাচরিত নিয়মটি মেনে নেয় নি। মানুষ তার প্রয়োজনের উর্দ্ধে কর্ম করতে চেয়েছে। পশু এবং মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটি হল - পশু তার নিত্য প্রয়োজনের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ, কিন্তু মানুষ নয়।

"The most important distinction between the animal and man is this, that the animal is very nearly bound within the limits of its necessities, the greater part of its activities being necessary for self-preservation and the preservation of the race."[৪]

মানুষ শুধুমাত্র প্রয়োজনের সীমাতেই আত্মসংরক্ষণ (Self preservation) করেনি। প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে মানুষ আকাশকে দেখেছে, শিল্প (Art) সৃষ্টি (creation) করেছে তার উদ্বৃত্তের (surplus) কারনে। "The animal must have knowledge, so that their knowledge can be employed for useful purposes of their life. But there they stop."[৫] জীবন ধারনের জ্ঞান পশুর মধ্যে থাকতে হয়, কিন্তু পশু সেখানেই থেমে যায়। এর অতিরিক্ত জগৎকে জানতে সে চেষ্টা করেনি কখনও।

---

[৩] Tagore, Rabindranath, Chitralipi 1, Visva-Bharati, 2008, p.20.

[৪] Tagore, Rabindranath, Personality, Rupa Publicaitons, 2019, P. 7.

[৫] Tagore, Rabindranath, On Art and Aesthetics (A Selection of Lectures, Essays and Letters), Subarnarekha, 2005, P. 13.

প্রসঙ্গত প্রশ্ন ওঠে, জীবনধারনের সাধারণ জ্ঞান কী তাহলে মানুষের জন্য আবশ্যক নয়? উত্তরে বলা যায় মানুষকেও বাঁচতে হয়। তাই জীবনধারনের সাধারণ জ্ঞান মানুষেরও নিশ্চিতরূপে আবশ্যক। কিন্তু মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত একটা সৃজনী (creative) শক্তি (energy) থাকে যেটা মানুষকে কেবলমাত্র আত্ম-সংরক্ষণ (self-preservation)-এ সীমাবদ্ধ রাখে না।

রবীন্দ্রমতে, "For man, as well as for animals, it is necessary to give expression to fillings of pleasure and displeasure, fear, anger and love. In animals these emotional expressions have gone little beyond their bounds of usefulness. But in man, though they still have their roots in their original purposes, they have spread their branches far and wide in the infinite sky. Man has a fund of emotional energy which is not all occupied with his self-preservation. This surplus seeks its outlet in the creation of Art, for man's civilization is built upon his surplus."[৬]

পশু তার প্রয়োজন ও আপন উপস্থিতিটুকু কেন্দ্র করে বাঁচে। কিন্তু মানুষের মধ্যে সেই প্রয়োজনকে পেরিয়ে এক সত্য রয়েছে আদর্শরূপে; যা নিত্য প্রয়োজনের আদর্শ নয়। এই আদর্শ তাকে পূর্ণতা দেয় এবং মানুষ অনন্তকে লাভ করে। সেখানে সে সত্য (True)। তখন ব্যক্তিগত সত্তাকে ছাপিয়ে সে বিশ্বমানবের (Universal Man) সন্ধান পায়, নিজেকে জানতে পারে এবং মুক্তি (freedom) লাভ করে।

মানুষ তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে মুক্ত নিয়মের ভঙ্গিমায়। শুরুর থেকেই তার দুপায়ের উপর ভর করে দাড়ানোর ঘটনাটিকে প্রকৃতির পুরোপুরি বাধ্য না হওয়ার ইঙ্গিত রুপে গন্য করা যেতে পারে। জন্তু নিচের দিকে ঝুঁকে দেখেছে খন্ড খন্ড বস্তুকে। আর মানুষ উপরে মাথা তুলে যা দেখলো তা কেবলমাত্র বস্তু নয়, দৃশ্য। চেতনার দ্বিতীয়স্তর থেকে সর্বোচ্চস্তরে উন্নীত হওয়া আদতে ঐক্যের একরকম রুপান্তর ঘটায়। দ্বিতীয় স্তরের মানুষ

---

[৬] Tagore, Rabindranath, Personality, Rupa Publicaitons, 2019, P. 8.

এবং প্রকৃতি যুক্তি দ্বারাই ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু সর্ব্বোচ্চস্তরে মানুষ প্রেম ও অনুভব দ্বারা প্রকৃতির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ । মানুষ তখন জগতকে খন্ডিতরূপে নয়, সমগ্ররূপে জানতে চায়।

সে নিজেকে প্রকৃতিরই একটি অংশরূপে অনুভব করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন "মানুষের দেহে শুদ্রের পদোন্নতি হল ক্ষাত্রধর্মে, পেল সে হাতের গৌরব, তখন মনের সঙ্গে হল তার মৈত্রী। মানুষের কল্পনাবৃত্তি হাতকে পেয়ে বসলো। দেহের জরুরী কাজগুলো সেরে দিয়েই সে লেগে গেল নানা বাজে কাজে। জীবন যাত্রার কর্মব্যবস্থায় সে whole time কর্মচারী রইল না। সে লাগলো অভাবিতের পরীক্ষায়, অচিন্তাপূর্বের রচনায় - অনেকটাই অনাবশ্যক। মানুষের ঋজু মুক্ত দেহ মাটির নিকটস্থান ছাড়িয়ে যেতেই তার মন একটা বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলো যা অন্নব্রহ্মের নয়, যাকে বলা যায় জ্ঞানব্রহ্মের, আনন্দব্রহ্মের রাজ্য।" [৭]

নতুন জগতে প্রবেশ করে মানুষ তার কল্পনা দিয়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে জগৎ রচনা করে। কারন মানুষ আছে মুলত দুটি ভাব নিয়ে। একটি জীবভাব, যেটি আমাদের অবগত। দ্বিতীয়টি হল বিশ্বভাব। তাই প্রাথমিক স্তরে মানুষ তার স্বার্থসত্তার সমস্ত বস্তুকে কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষন করলেও দ্বিতীয়স্তরে সে তার উর্দ্ধে। এই স্তরে মানুষ সৃজনশীল। মানুষ তখন জগৎকে বিশ্বজগৎরূপে দেখতে উদ্যত হয় এবং সে কল্পনা দিয়ে স্বাধীন হতে চায়। মানুষ সেখানে ঐক্যবদ্ধ, মুক্ত এবং একজন সম্পর্কীত সত্তা। আপন কল্পনা দিয়ে মানুষ মুক্তি, পূর্ণতা ও আনন্দ লাভ করতে চায়। বলা বাহুল্য, এই আনন্দ লাভ না হলে তার আত্মা তার কাছে অর্থহীন যন্ত্রনামাত্র। তাই বলা যায় মানবদেহ দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে, মুক্তি লাভ করেছে। নব সৃষ্টি সত্তা ছাপিয়ে যায় তার শরীর অতিরিক্ত বর্তমান ব্যবহারিক চাহিদাভিত্তিক জীবনকে। কারন সেখানে মন যোগদান করেছে। আর মনের উপস্থিতি এক বিরাট পরিবর্তন ঘটায় মনুষ্য জীবনে। সমস্ত চাহিদাগুলি ওলট-পালট হয়ে যায় মনের উপস্থিতিতে।

---

[৭] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মানুষের ধর্ম, বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪১৮, পৃ. ১৬।

রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষের ইতিহাস হল তার 'ছোট আমি' থেকে 'বড় আমি' তে উন্নীত হওয়ার মধ্য দিয়ে একপ্রকার অগ্রগতির ইতিহাস। মানবিক চেতনার দুটি স্তরে আমরা লক্ষ্য করেছি মানুষ সক্রিয় রূপে সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে যুক্ত এবং সে সৃজনশীল। সে নিজেকেই প্রকাশে রত। সে তার শিল্পসত্তা দিয়ে সৃষ্টি করতে চায়, উপভোগ করতে চায় সৌন্দর্যকে।

উন্নত চেতনস্তর হল মানুষের সৃষ্টিশীল চেতনার স্তর। এই স্তরে মানুষের ছোট আমি বা ব্যক্তিগত আত্মার প্রয়োজনগুলি সর্বদা পূরণ হয় না। কারন তা মানুষের বড় 'আমি'-র চেতনার প্রতি ঐক্যতার আবেদন জানায়। তখন মানুষের 'ছোট আমি' 'বড় আমি- র দিকে উত্তীর্ণ হয়। অর্থাৎ 'আমার আমি' 'মহা আমি'তে উত্তীর্ণ হয়ে সার্থকতা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – ''ছোট-আমি জোড়ে [য] হাতে প্রার্থনা করচে, নমস্তেহস্তু – বড়কে আমার নমস্কার সত্য হোক্, নিজের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পাই।" [৮]

'ছোট আমি' হল ক্ষুদ্র, স্বার্থসংকীর্ণ, নিজের মধ্যেই সীমিত। আমাদের প্রাত্যহিক অহংবোধকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ছোট আমি'। তাঁর মতে, 'ছোট আমি' হল অহংকেন্দ্রীক। তাই এটি হল বিশেষ। এই 'ছোট আমি' কে 'বড় আমি হয়ে উঠতে হবে। আর এই ক্রমশ হয়ে ওঠা বা বৃহৎ এর দিকে অগ্রসর হওয়াটাই মানবজীবনের পরমলক্ষ্য। 'আমি'তে সীমাবদ্ধ থাকাতে কোনোরকম সার্থকতা নেই। তাই Being বা অস্তিত্ব নয়, Becoming বা হয়ে ওঠার চেষ্টাতেই সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ 'ছোট আমি' ও 'বড় আমি'কে স্বতন্ত্র করেছেন। 'ছোট আমি' কে তিনি 'self' বলেছেন –

"The self that is unyielding and narrow, that reflects no light, that is blind to the infinite"।[৯] অর্থাৎ self হল ক্ষুদ্র এবং অসীম থেকে বিচ্যুত। অন্যদিকে বড় আমি'কে তিনি 'soul' বলেছেন- "It is only the soul, the one in man which by its very nature can overcome all limits, and finds its affinity with the supreme one"।[১০]

---

[৮] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (অষ্টাদশ খন্ড), বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪২০, পৃ. ৭৯।

[৯] Tagore, Rabindranath, Sadhana, Soul Conciousness, Rupa Co., 2005,P.33

[১০] Ibid, P. 37

অর্থাৎ soul স্বভাবতই সকল সীমাকে অতিক্রম করে, অসীমের সঙ্গে যুক্ত হয়।

মানুষের প্রকৃতিই হল ছোট আমি থেকে বড় আমির দিকে অগ্রসর হওয়া। 'বড় আমি' এবং 'ছোট আমি' র মধ্যে তফাৎটি হল 'বড় আমি' পরমসত্ত্বা। সর্বদা তিনি পূর্ণ হয়ে আছেন। অন্যদিকে ছোট আমি-কে সর্বদা পরিপূর্ণ হওয়ার চেষ্টা করতে হয়। ছোট আমি কি পাব, কি পায়নি তাতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই পাওয়া অতিরিক্ত হয়ে ওঠা-তেই পরম সার্থকতা বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তিনি বলেছেন -- "আমরা প্রত্যেকেই একদিকে অত্যন্ত ছোট আর একদিকে অত্যন্ত বড়। যে দিকটাতে আমি কেবলমাত্রই আমি - সকল কথাতেই ঘুরে ফিরে কেবলই আমি কেবল আমার সুখ-দুঃখ ,আমার আরাম, আমার আয়োজন, আমার প্রয়োজন আমার ইচ্ছা সে দিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখতে চাই সে দিকটাতে আমি তো একটি বিন্দুমাত্র সে দিকটাতে আমার মত ছোটো আর কে আছে। আর যে দিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ আমাকে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণতা - যে দিকে আমার সমস্ত জগৎ আমাকে প্রার্থনা করে, আমার সেবা করে, তার শতসহস্র তেজ ও আলোকের নাড়ীর সূত্রে আমার সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে, আমার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত লোকলোকান্তর পরম আদরে এই কথা বলে যে তুমি আমার যেমন এমনটি কোথাও আর কেউ নেই- অন্তরের মধ্যে তুমি কেবল তুমি সেইখানে আমার চেয়ে বড়ো আর কে আছে।"[১১]

বড় আমি হল 'পরমাত্মা' আর ছোট আমি হল 'অহং'। এই 'অহং' তার স্বার্থকে অস্বীকার করতে পারে না। নিজ বিষয়ে সে সদা চিন্তিত। কারণ –

"All our egoistic impulses, our selfish desires, obscure our true vision of our soul. For they only indicate our own narrow self. When we are conscious of our soul, we perceive the inner being that transcends our ego and has it's deeper affinity with the all."[১২] অর্থাৎ আমাদের আত্মকেন্দ্রিকতা স্বার্থপরতাগুলি আত্মার প্রকৃত রূপটিকে ঢেকে দেয়। কিন্তু যখন আমরা আমাদের আত্মা সম্পর্কে সচেতন থাকি, তখন আত্মকেন্দ্রিকতা ক্রমশ অস্পষ্ট হতে

---

[১১] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন (দ্বিতীয় খন্ড), বিশ্ব ভারতী, ১৪২৩, পৃ. ৩৫২।

[১২] Tagore, Rabindranath, Sadhana, Rupa Co., 2005, P. 23.

থাকে এবং তখন সকলের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে সম্পর্কীত হয়ে থাকি। তাই. বড় আমি হল বৃহৎ, স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত অসীমের সঙ্গে যুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ বড় আমি' ও 'ছোট আমির প্রসঙ্গে বলেছেন- "At one pole of my being I am one with stocks and stones. There I have to acknowledge the rule of Universe law"[১৩] অন্যদিকে তিনি বলেন- "But in the other pole of my being am separate from all. There I have broken through the cordon of equality and stand alone as an individual. I am absolutely unique, am 1. I am incomparable. The whole weight of the universe cannot crush out this individuality of mine. I maintain it in spite of the tremendous gravitation of all things. It is small in appearance but great in reality"[১৪] অর্থাৎ যখন আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তারচিন্তায় মগ্ন থাকি, তখন আমাদের অহংবোধ জাগ্রত হয় এবং সকলের থেকে নিজেকে পৃথক মনে করি।

কিন্তু যখন মানুষের বড় আমি সংকীর্ণ অহংবোধকে ত্যাগ করে সকলের সঙ্গে নিজেকে মিলিত করে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে ঐক্যস্থাপন করে, তখন ব্যক্তিসত্তা পরমসত্তাকে উপলব্ধি করে। পরমসত্যকে উপলব্ধি করে পরম আনন্দ লাভ করে। সাধনায় তিনি শিশুদের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি সুস্পষ্ট করেন. "Children, when they begin to learn each separate letter of the alphabet find no pleasure in it, because they miss the real purpose of lesson: They become a source of joy to us only when they combine into words and sentences and convey an idea. Likewise our soul when detached and imprisoned within the narrow limits of a self loses it's significance. For its very essence its unity. It can only find out it's truth by unifying itself with others, and only then it has its joy."[১৫]

---

[১৩] Ibid, P. 57

[১৪] Ibid, P. 57

[১৫] Ibid, P. 23

অর্থাৎ একটি শিশু যখন একটি অক্ষর প্রথম শেখে তখন সেটিতে কোনোরূপ আনন্দ হয়না। কিন্তু যখন শিশুটি কতকগুলি শব্দকে মিলিত করে একটি বাক্য তৈরী করে - তখন সেটি আমাদের আনন্দের উৎসের কারণ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবেই 'ছোট আমি' যখন তার সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে 'বড় আমি'তে উত্তীর্ণ হয় তখন সকলের সঙ্গে ঐক্যলাভ করে আনন্দ অনুভব করে। রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন- "It very often happens that our love for our children, our friends, or other loved ones, debars us from the further realization of our soul. It enlarges our scope of consciousness no doubt. Yet it sets a limit to its freest expansion Nevertheless it is the first step, and all the wonder lies in this first step itself. It shows to us the true nature of our soul. From it we know, for certain, that our highest joy is in the losing of our egoistic self and in the uniting with others".[১৬]

এরূপে 'ছোট আমি' তার ক্ষুদ্র স্বার্থসত্তা পরিত্যাগ করে বড় আমিতে পরম আনন্দ লাভ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে অস্তিত্বের দ্বৈতরূপ লক্ষ্য করা যায়। একই মানবের মধ্যে দুইটি আমি বিরাজ করে। একই ব্যক্তিতে 'ছোট আমি' ও 'বড় আমি' অবস্থান করে। অহং হল 'ছোট আমি' এবং 'বড় আমি' হল মানবাত্মা বা পরমাত্মা। 'ছোট আমি' আত্মকেন্দ্রীক। রবীন্দ্রদর্শনের ন্যায় উপনিষদেও মানুষের দুটি সত্তার কথা বলা হয়েছে। তৈত্তেরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে -

'অহং বৃক্ষস্য বেরিবা কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব।
উর্দ্ধপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি।' ১/১০[১৭]

অর্থাৎ আমি (অহং) সংসার নামক বৃক্ষের রচনাকারী। পর্বতপৃষ্ঠের মতোই আমার কর্ম উন্নত এবং আমিও সূর্যের অমৃতের ন্যায় সেইরূপ। এক্ষেত্রে অহংকে বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের মতে 'ছোট আমি' থেকে বড় আমিতে উত্তরণের মধ্যে দিয়ে বৃহৎ অর্থে অহং এর মহত্তমরূপটি উপলব্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে উপনিষদের ন্যায় রবীন্দ্রদর্শনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - "তাহলে দেখা যাচ্ছে এই যে

---

[১৬] Ibid, P. 25.

[১৭] অবধূত, কালিকানন্দ (সম্পাদিত), উপনিষদ সমগ্র, গিরিজা লাইব্রেরি,২০২১, পৃ.১৮৬।

আমিত্ব ব'লে একটি জিনিস এর দ্বারাই জগতের অন্য সমস্ত কিছু হতেই আমি স্বতন্ত্র। আমি জানছি যে আমি আছি এই জানাটি যেখানে জাগছে সেখানে অস্তিত্বের সীমাহীন জনতার মধ্যে আমি একেবারে একমাত্র। আমি হচ্ছি আমি এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মান্ডকে নিজের থেকে একেবারে চিরবিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে নিখিলচরাচরকে আমি এবং আমি না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।"[১৮] কিন্তু যখন এই দুটি অংশকে আসলে একই সত্তার দুটি অভিব্যক্তি রূপে আবিষ্কার করা হয় তখন ঐক্যলাভ করে পরমসত্যে উপনীত হয়ে পরম আনন্দ লাভ করা যায়। এই সত্যানুভূতির মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি বিশেষ পরম সত্তায় নিজেকে উপলব্ধি করে ও বিশ্বের সমস্ত কিছুর সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে। এই প্রকার ভালোবাসা সৃজনশীল।

এক্ষেত্রে সকলেই সেই পরমসত্তার অংশ। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন আমাদের প্রাত্যহিক কর্ম এবং হৃদয় বৃত্তির সমস্ত শক্তি দিয়ে মানবথেকে মহা মানবে উত্তরণ সম্ভব হয়। তাই তিনি বলেছেন- "In its finite aspect the self is conscious of its separateness, and there it is ruthless in its attempt to have more distinction than all others. But in its infinite aspect I its wish is to gain that harmony which leads to its perfection and not its mere aggrandizement"[১৯] অর্থাৎ মানুষ যখন তার স্বার্থসিদ্ধিতে আবদ্ধ থাকে তখন অন্যের থেকে সে কেবলই নিজেকে পৃথক করে অহংকে স্বীকার করে কিন্তু যখন সে তার অহং কে অতিক্রম করে তখন অন্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে। নিজের মধ্যে অন্যকে এবং অন্যের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে পরম সত্যে উপনীত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শিল্প ও সৃজনশীলতা সমন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অবসরের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। এখন প্রশ্ন ওঠে, অবসর কি সৃজনশীলতার একটি কারন ?

---

[১৮] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন (দ্বিতীয় খন্ড), বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪২৩, পৃ. ৩৫৩।

[১৯] Tagore, Rabindranath, Sadhana, Rupa Co., 2005, P. 71.

রবীন্দ্রনাথের মতে, উদ্বৃত্তের সৃজনীশক্তি একজন মানুষকে এবং তার চিন্তা সমূহকে এক স্বাধীন উচ্চতায়, এক চেতনস্তরের পথনির্দেশ করে। এইরূপ স্বাধীনতার অবস্থা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছুটি-র সঙ্গে বিষয়টি তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ কাজ- খেলা-সৃষ্টি ও ছুটির মধ্যে এক ধারাবাহিকতা আছে বলে উল্লেখ করেছেন। নির্ভেজাল ছুটী দেবতাদের জন্য। রবীন্দ্রনাথ নিজে পরীদের দেশের ছুটী আবিষ্কার করতে চান, কিন্তু এই জগতের নয়। যেখানে সপ্তাহের সব দিনগুলি ছুটির দিন, সেখানে ছুটির দিনের আদৌ প্রয়োজন নেই। যেখানে সকল কাজের মধ্যে বিশ্রাম থাকে সেখানে সকল কর্তব্যই আনন্দ সহকারে অকর্তব্য বলে দেখা হয়। অবসর বলতে সাধারণত প্রয়োজন অতিরিক্ত সময়কেই আমরা বুঝে থাকে। রবীন্দ্রনাথ 'অবসর' শব্দটি সম্বন্ধে একটি অতিসূক্ষ্ম তারতম্য প্রদান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, একজন ব্যক্তিকে সুখী বলা হবে, যখন তার অপরিব্যাপ্ত সময় দেখারও সুযোগ থাকে। তাঁর সমৃদ্ধি হল মানসিক, কারন তিনি তার অবসরকে কাজে লাগাতে সক্ষম। অবসরকে সৃষ্টির মধ্যে কাটাতে হবে।অবসরের সময় সৃষ্টির কাজ করলে সেটি হয় ছুটী। তাই আমাদের কর্মগুলিকে বন্ধনমুক্ত হতে হবে। বন্ধনমুক্ত কর্মগুলি ছুটির দিন সৃষ্টি করে। সেগুলি একজন মানুষের চেতনস্তরগুলি পরিবর্তিত করে উন্নত চেতনস্তরে পৌঁছে দেয় এবং এক ঐক্যের আদর্শের দিকে ধাবিত করে।

আমরা এখন পর্যন্ত যা আলোচনা করলাম, সেই প্রসঙ্গটিতে কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ উদ্বৃত্তের সৃজনীশক্তি দ্বারাই পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য করেছেন। তিনি উদ্বৃত্তের সৃজনীশক্তি পশুর মধ্যে স্বীকার করতে রাজী নন। কারন সে আপনাকে প্রকাশে ব্যর্থ। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে যে, বিষয়টি কতটা যুক্তিযুক্ত? কারন একজন মানুষের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের সৃজনীশক্তি স্বীকার করা হয়েছে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাই। কিন্তু যদি বলা হয়, মানুষের প্রকাশভঙ্গি স্পষ্ট আর পশুর অস্পষ্ট তাহলে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে অসংগতি, দৃষ্ট হয়। কারন পশুর উদ্বৃত্তের উপলব্ধি হয় কী হয় না, তার তীব্রতার উপরে নির্ভরশীল। তার প্রকাশ যদি দৃষ্ট না হয় সেক্ষেত্রে একথা ধরে নেওয়ার কোনো কারন নেই যে, পশু উদ্বৃত্তের সৃজনীশক্তির গন্ডীর বাইরে।

এছাড়া, আরেকটি প্রশ্ন ওঠে, রবীন্দ্রনাথের মতে, সৃষ্টির মূল্য জীবনযাত্রার উপযোগীতায় নয় - মানবাত্মার পূর্ণস্বরূপের বিকাশে-সত্যিই কি তাই? এক্ষেত্রে জীবনযাত্রার উপযোগিতার দিকটিকেও সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ তা জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

আরও বলা যায়, যদি বিচার করে দেখা হয় তাহলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের শিল্পী হল দেবত্বের দিকে অনুগামী। সূক্ষ্ম আবেগ-সম্পন্ন একজন মানুষ। এই সমস্ত গুণ সম্পন্ন মানুষ, কখনই কোনো তত্ত্বাবধানের অধীনে কর্ম করতে পারে না তার কর্মগুলি তার স্বাধীনতা প্রকাশ করে কিছু বিধিনিষেধসহ।

এক্ষেত্রে বলা যায়, মানুষ কী ধাতু নির্মিত একটি যন্ত্র যে, সে কঠিন নিয়মানুসারে কাজ করবে? মানুষের মন এতই বড় ও বিচিত্র, ও এর চাহিদা এত বিভিন্ন প্রকার যে এটি একই বৃত্তে পাক খাবে? উদ্বৃত্তের সৃজনীশক্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষকে মানবসুলভ তৈরী করে প্রমান করে যে, সে সৃষ্টিশীল। সে কেবল পদার্থের সমষ্টিমাত্র নয়। কঠোর নিয়মানুবর্তীতা দ্বারা আবদ্ধ মানুষ, প্রকৃতপক্ষে জীবিত নয়। মানুষ জগতে সমস্ত কিছুর সঙ্গে ঐক্যলাভ করে, আনন্দ লাভ করে। এটি উদ্বৃত্তের সৃজনী শক্তির মধ্য দিয়েই সম্ভব, শুধুমাত্র ব্যবহারিক জীবনযাত্রার উপযোগিতা দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন

এখন আমরা মূলত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন এবং শিক্ষা সম্পর্কীত রবীন্দ্র মনোভাব নিয়ে আলোচনা করবো। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন প্রসঙ্গে আলোচনা পূর্বে, একথা উল্লেখ করা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথ মূলত একজন কবি, ভারতীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি তাঁর প্রভাব বিস্তার করে গেছেন। ভারতীয় শিক্ষা রীতি তার থেকে বাদ পড়েনি। তাঁর শিক্ষাদর্শন শুধুমাত্র তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি নিজেই তাঁর বাস্তব প্রয়োগ করেছিলেন শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তাঁর শিক্ষাদর্শন ভীষণভাবে বাস্তববাদী। দার্শনিক চিন্তাধারার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে একজন ভাববাদী (Idealist) হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তিনি ভীষণভাবে উপনিষধীয় চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই 'রবীন্দ্রদর্শন - উপনিষদের আলোকে'[১] সৃষ্ট। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সৃষ্টির মূলে আছে এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক শক্তি। এই শক্তি সকল সৃষ্টির মধ্যে সতত বিকাশমান। পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যে এই সত্তা প্রকাশিত। মানবসমাজে, মানব আত্মায় সর্বত্র এই শক্তির বিকাশ বিরাজমান। একে তিনি বলেছেন বিশ্বচেতনা। এ বিশ্বচেতনা সুসামঞ্জস্যরূপে সর্বত্র বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মানুষ এই বিশ্বচেতনাকে উপলব্ধি করার জন্য সতত চেষ্টায় রত এবং পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের মাধ্যমে তা লাভ করা সম্ভব। শিক্ষা এইরূপ আত্মবিকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হতে পারে।

মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে সবথেকে বৃহৎ পার্থক্য হল - মানুষ চেষ্টার দ্বারা তারা লক্ষ্যে পৌঁছেছে আদিমযুগ থেকে। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মকে পরিবর্তিত করে মানুষ বিকাশ লাভ করেছে। সৃষ্টির শুরুর থেকেই মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষণীয়। তার ফলে মানুষ পরমানন্দ লাভ করে। তাঁর জীবন দর্শনের মূল বক্তব্য হল - বিশ্ব বৈচিত্রের মাঝে ঐক্যের নিয়মকে জেনে, তাকে আনন্দরূপে লাভকরাই হল মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা। রবীন্দ্র জীবন দর্শনের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রশিক্ষা দর্শন। রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন বিশেষত ভাববাদী (Idealist) চিন্তাধারার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ একথা পূর্বেই উল্লিখিত। তবে একদিকে তার শিক্ষাদর্শন ভাববাদী চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েও, প্রয়োগের সময় লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি ভীষনরূপে প্রকৃতিবাদী বা স্বভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। তিনি যেমন, বিশ্বমানবাত্মার পরিপ্রেক্ষিতে মানব জীবনের উদ্দেশ্য করেছেন, শিক্ষার সংজ্ঞাও দিয়েছেন সেই নীতির উপর ভিত্তি করে।

রবীন্দ্রনাথের মতে, সেটাই প্রকৃত শিক্ষা, যা কেবলমাত্র তথ্য পরিবেশনই করে না। যা বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে, ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশে সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন কি?- তা একটি বাক্যে বলতে হলে বলা যায়, এটি শিক্ষার্থীর স্বাধীন, সতন্ত্র, ব্যক্তিত্বের ও মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের কথা বলে। আর তাঁর নিজের ভাষায় অন্তরআত্মার বিকাশ।

---

[১] মুখোপাধ্যায়, রমারঞ্জন, রবিসন্ধ্যা দ্বিতীয় সংখ্যা, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, জুন, ২০০৫, পৃ.১৮।

রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক গতানুগতিক শিক্ষাকে ভীষণভাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন - ''তুমি কেরাণির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুনসেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনক্রমে ইস্কুল মাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে' - এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায়না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই''[২] কারণ আমাদের গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ভারতবর্ষের আদর্শকে স্থান দেওয়া হয়নি। ভারতবর্ষ চিরদিনই কিছু নৈতিক আদর্শের উপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। চিরদিনই বিশ্বসত্তার বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে এসেছে। তাই তার শিক্ষার লক্ষ্য যদি তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতীকরূপে দেখা না দেয়, তাহলে তা সমাজের উদ্দেশ্য সাধন এবং সমাজের বিকাশ সাধন করতে ব্যর্থ। সুতরাং আমাদের দেশবাসীদের একথা মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষের এই সাধনাতে ব্রতী হওয়াই ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। তবে সে শিক্ষা কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষাও নয়। বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে স্থান দিতে হবে। তবে সে শিক্ষা হবে যথার্থ শিক্ষা, পরিপূর্ণ শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন মূলত, এমনই এক যথার্থমুক্ত শিক্ষার কথা বলে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ প্রসঙ্গে বলেছেন - ''যেমন করিয়া হউক, আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতেই হইবে। সেই শক্তিকে ও উদ্যমকে সফলতার পথে প্রবাহিত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেকে লইতে হইবে। দেশের কাজে যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে চান এইটেই তাঁহাদের সবচেয়ে প্রধান কাজ।''[৩] কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রণালীকে জাতীয় নামে চিহ্নিত করা যায়না। কারণ যখন কোনো স্বজাতীয় বা বিজাতীয় শাসনের দ্বারা কোনো একটি নির্দিষ্ট শিক্ষার পদ্ধতি বেঁধে ফেলতে চায় মানুষকে, তখন সেটাকে কখনই আদর্শ শিক্ষা বলা যায় না। তখন এই আদর্শটি সাম্প্রদায়িক এবং দেশবাসীর জন্য সেই নির্দিষ্ট সীমিতশিক্ষার আদর্শ ভীষণরূপে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে একথা রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ এমন এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যে শিক্ষা স্বজাতির নানান মানুষের নানান চেষ্টার দ্বারা চালিত হয়। আর তাকেই জাতীয় বলা যায়।

---

[২] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, বিশ্বভারতী, ১৪১৭, পৃ.১৩২।

[৩] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, বিশ্বভারতী, ১৪১৭, পৃ.১২৮।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন অনুশীলন করে আমরা দেখি যে, তিনি একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের অস্ত্র হিসাবে ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন মূলত সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সমকালীন সমাজের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদ। এককথায়, তৎকালীন স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে তিনি এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তাঁর মতে, মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক নির্দিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থার যন্ত্রনায় জর্জরিত। এই যন্ত্রনাকে তিনি অমোঘ বলে মেনে নেননি, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষাকে আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক করে তুলতে ব্রতী হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আশ্রমিক শিক্ষা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে তিনি দেখেছিলেন খাঁচা, তোতাকাহিনী আর রাশি রাশি পুঁথি। তাঁর মতে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার অঙ্গ। চলবে তার সঙ্গে এক তালে, লয়ে, সুরে এবং তা দৈনন্দিন যাপিত অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। জীবন চলার পথে শিক্ষা যে অপরিহার্য্য একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সচেতন হোক বা অচেতন হোক প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটি মানুষকেই শিক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু হঠাৎ যদি প্রশ্ন ওঠে শিক্ষা কি? - তাহলে অনেকের পক্ষেই ব্যাপারটি অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানসিকতার যেমন বিবর্তন ঘটেছে, তেমনি শিক্ষাকেও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারনত, মানুষ কেবল তথ্য আহরণকেই শিক্ষা বলে মনে করতো। শিক্ষকের কাছ থেকে বা বই পড়ে যেভাবেই হোক না কেন কিছু না জানা বিষয়কে জেনে নেওয়াই ছিল শিক্ষা। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থীর মন যেন শূন্য জলপাত্র আর শিক্ষক বা বই থেকে সেই পাত্র পূর্ণ করাই হল শিক্ষা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষা কেবল পুঁথি পড়া নয়। তিনি এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন ''জীবনের ক্ষেত্রকে বড়ো করিয়া দেখিতে পাই না বলিয়াই জীবনকে বড়ো করিয়া তোলা এবং বড়ো করিয়া উৎসর্গ করিবার কথা আমাদের স্বভাবত মনেই আসেনা। সে সম্বন্ধে যেটুকু চিন্তা করিতে যাই তাহা পুঁথিগত চিন্তা, যেটুকু কাজ করিতে যাই সেটুকু অন্যের অনুকরণ।''[৪] তাই জীবনের ক্ষেত্রকে বড় করতে হলে শিক্ষার লক্ষ্যটি স্থির হওয়া দরকার। শিক্ষার লক্ষ্য স্থির হলে জীবনের বৃহৎরূপ দেখা যায়।

তাই মানবজীবনের পরম লক্ষ্যটি স্পষ্ট হওয়া দরকার। জীবনের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাগুলি ত্যাগ করে বৃহৎ জীবনের লক্ষ্য স্থির হওয়া চাই। আমাদের দেশে সচেতনভাবে এই লক্ষ্য ও আদর্শ স্থির হলে আমাদের

---

৪ ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ. শিক্ষা. বিশ্বভারতী. ১৪১৭. পৃ.১৩১।

দেশের শিক্ষাকে সত্য আকার দেওয়া সম্ভব। কিন্তু জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই অথচ শিক্ষা আছে এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন।

শিক্ষা জীবন এবং যাপিত অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বরং এক, এ কথা পূর্বেই উল্লেখিত। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার নিয়মের থেকে রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শন ভীষণভাবে বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ দেশের মানুষের জন্য যে শিক্ষা কামনা করেছেন তা ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয় বোধের শিক্ষা। তিনি মনে করতেন, শিক্ষার জন্য জীবন নয়, জীবনের জন্য শিক্ষা। রবীন্দ্রজীবনদর্শনের ন্যায় রাবীন্দ্রশিক্ষাদর্শনে মানুষ ভীষন ভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে pipeline process বলা যায়। এখানে শিক্ষার্থী বিদ্যালয় বা শিক্ষকের কাছ থেকে অনবরত তথ্য সংগ্রহ করে জ্ঞানলাভ করে। বলা বাহুল্য, দুর্ভাগ্যর বিষয় আমাদের দেশের বহু মানুষ শিক্ষা বলতে এখনও পর্যন্ত এই বিশেষ পদ্ধতিকেই বোঝেন এবং আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলিতে বর্তমান অনুসৃত পদ্ধতি এর থেকে খুব বেশি উন্নত নয়। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার এই ধরনের অসম্পূর্ণতার কথা অনুভব করেছেন এবং তার উন্নতি সাধনে প্রয়াসী হয়েছেন। জ্ঞান সম্পর্কে সংকীর্ণ মতবাদের জন্যই শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে এই সংকীর্ণ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

এক্ষেত্রে জ্ঞানকে আমরা দুভগে ভাগ করে বিষয়টি বুঝতে পারি। একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা ভিত্তিক জ্ঞান এবং অন্যটি চিন্তালব্ধ ও বিমূর্ত জ্ঞান। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে বিমূর্ত জ্ঞানই কি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান? এবং প্রত্যেক অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে তার কি কেনো সম্পর্ক নেই? সংকীর্ণ অর্থে পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া তত্ত্বগত জ্ঞানকে স্মৃতি দিয়ে আয়ত্ত করাই হল শিক্ষার কাজ। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে এই ধারণা, সংকীর্ণ, অসম্পূর্ণ এবং আংশিক সত্য। কারণ প্রত্যেক তত্ত্বগত বিষয়ের একটি বাস্তব ভিত্তি থাকা প্রয়োজন। দৈনন্দিন যাপিত অভিজ্ঞতার জ্ঞানকে আমরা আমাদের চিন্তা, যুক্তি ও অন্ত:সমীক্ষার মধ্য দিয়ে আত্মস্থ করি। তাই সত্যজ্ঞান কখনই একজন মানুষের মধ্যে বাইরে থেকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায় না। আত্মচেষ্টার মাধ্যমে তা অর্জন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই অভ্যন্তরীণ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই, শিক্ষাগ্রহণের তাগিদটি ভেতর থেকেই উপলব্ধ হয়। কোনো স্থির গতানুগতিক অপরিবর্তনীয় তথ্যের আহরণ কখনই গতিশীল জীবনের উপযোগী হয় না। মানুষ যে জন্মগত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়, তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি সেই সম্ভাবনার স্বাভাবিক বিকাশের অনুকূল নাও হতে পারে। তাই পরিবর্তনশীল পরিবেশেরে সঙ্গে, সার্থক অভিযোজনের জন্য মানুষকে প্রতি পদক্ষেপে তার প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বভাব ও প্রাথমিক আচরণ ধারা পরিবর্তন ঘটিয়ে চলতে হয়। এই পরিবর্তনই শিক্ষা। শিক্ষা তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন ও পরিমার্জন প্রক্রিয়া। সমস্ত জীবনই এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে জীবন

থেকে পৃথক করে দেখেননি। তাই শিক্ষা হবে জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তিনি বলেছেন "কিন্তু শুধু যন্ত্রে কোনো কাজ হয়না যন্ত্রী যদি মানুষ হয়ে না ওঠে। ... আমি বরাবর বলে এসেচি শিক্ষাকে জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে চালানো উচিত"[৫] রবীন্দ্রনাথ এমন এক সাবলীল স্বত:স্ফূর্ত শিক্ষার কথার বলেছেন যা জীবনের সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর এমন এক প্রাণের সম্পর্ক স্থাপন হবে যে তাকে নিজের থেকে আলাদা বলে মনে না হয়। জীবন ও শিক্ষা এক। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা একপ্রকার দমবন্ধকর ছিল ছাত্র ছাত্রীর নিকট। এইপ্রকার শিক্ষায় জীবনচর্যার বা চর্চার কোনো প্রতিফলন ছিলনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হতে চেয়েছেন, যা একজন শিক্ষার্থীর প্রাকৃতিক সত্তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বরং এক। এই প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে এবং আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করবে। কারণ সমস্তরকম শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের জন্য স্বাধীনতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমটিও যাতে শিক্ষার্থীর কাছে বোঝা হিসাবে উপলব্ধ না হয় সেটি দেখা বিশেষ প্রয়োজন বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন।

"Freedom is necessary for growth of all kinds, mental or physical. Too much of routine throttles the growth of the pupil. In Gurudeva's school, except for the regular lessons, the children were free to choose their own hobbies and occupations. There were the games, and then, some read, some wrote, some tended the plants in their own gardens. Their reading was not confined to the text-books, nor their writing to 'exercises'. There was the story-telling group. There were so many other alternatives to choose from."[৬]

আমাদের শিক্ষা যে আমাদের সত্তার থেকে ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে তার অন্য একটি কারণ হল ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিক্ষার বিস্তার হোক। কারণ শিক্ষা বিস্তার লাভ না করলে তার গৌরব কোথায়?-এ কথা সত্য। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে সর্বজনীন শিক্ষার পথে ইংরাজি যে সর্বপ্রধান বাধা এবং মাতৃভাষাকে আমাদের শিক্ষার বাহন না করলে যে বিদ্যা প্রসার লাভ করবে না একথা জোরে সঙ্গেই তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে আক্ষেপ করে বলেছেন "মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালীকে

---

[৫] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (অষ্টাদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, ১৪২০, পৃ.৩৮৮।

[৬] Roy Kshitis, Visva-Bharati Quarterly, Education Number VOL. XIII, (Parts I & II), May-October, 1947, 2004, p. 13.

দন্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাকে, সমস্ত বাঙালীর এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কালে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই"?[৭] বলাবাহুল্য এ আক্ষেপের প্রশ্ন অধিকাংশ বাঙালী মননের। দেশজ ভাষার প্রতি দেশজ মানুষের অস্পৃশ্যতা রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার সার্বজনীনতার পথে বাধা হিসাবে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাকে প্রধানত দায়ী বলে মনে করেছেন। কিন্তু কখনই তিনি পুরোপুরি পাঠ্যক্রম থেকে ইংরাজী বাতিল করার কথা বলেননি। তিনি বলেছেন, ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই, শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন, ফরাসি, জার্মান শিখলে আরো ভাল।

অন্যদিকে ভাষার ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা হল আমাদের ভাষার সঙ্গে ভাবের সামঞ্জস্যের অভাব। বাল্যকাল থেকেই শিশুর ভাষাশিক্ষার সঙ্গে ভাবশিক্ষার মিলন হওয়া দরকার। কারণ বাল্যকাল থেকেই যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং সেই ভাবের সঙ্গে জীবন-যাপন নিয়মিত হয় তখন জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। মানুষ সহজ হতে পারে এবং তার মনের ভাব সহজে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু তৎকালীন বাঙালী সমাজে কিছু ব্যক্তি বাল্যকাল থেকে ইংরাজি ভাষায় শিক্ষিত হতে চেয়ে না পারে ইংরাজি ভাষাটিকে পুরোপুরি রপ্ত করতে, না পারে বাংলাভাষাকে। সেক্ষেত্রে তাদের ভাষার সঙ্গে ভাবের সামঞ্জস্য হয় না। ফলত তারা তাদের মনের ভাব দুটি ভাষাতেই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশে ব্যর্থ হয়। তৎকালীন পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ কামনা করেছিলেন – "এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, ... ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও।

আমরা আছি যেন –

পানীমে মীন পিয়াসী
শুনত শুনত লগে হাসি।

আমাদের পানিও আছে পিয়াসও আছে দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসিতেছে এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।"[৮]

অর্থাৎ ভাব ও ভাষা থাকা সত্ত্বেও তারা তা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। কারণ ইংরাজী একটি বিজাতীয় ভাষা। আমাদের মাতৃভাষার সঙ্গে এর শব্দবিন্যাস ও পদবিন্যাসের কোনপ্রকার মিল ছিলনা। সেক্ষেত্রে কোনো

---

[৭] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, ১৪১৭, পৃ.১৫০।

[৮] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, ১৪১৭, পৃ.১৮।

বিষয়ে শিশুর ধারণা স্পষ্ট হওয়ার পূর্বেই তাকে মুখস্থ করতে হতো। রবীন্দ্রনাথের মতে, তৎকালীন মাষ্টার মশাইরাও ভালোভাবে বাংলা বা ইংরাজি কোনোটাই জানতেন না। ফলে তারা শিশুদের শেখানোর থেকে ভুলটা বেশী শেখাতেন। Horse is a noble animal - এটিকে কিভাবে প্রকাশ করা যায়? যদি বলা হয় ঘোড়া একটি মহৎ জন্তু অথবা ঘোড়া অতি উঁচুদরের জানোয়ার, কিম্বা ঘোড়া জন্তুটা খুব ভালো - সেক্ষেত্রে এই সবকটি বর্ণনাই ছাত্রদের মন:পূত হত না। সেক্ষেত্রে গোঁজামিল দিয়ে অল্প শিখে কোনোপ্রকারে ভুলটাই শেখা হতো। ছাত্ররা মনে করতো "... 'টানিয়া বুনিয়া কোনো মতে একটা অর্থ বাহির করিতে পারিলে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই, পরীক্ষায় পাশ হই, আপিসে চাকরি জোটে'।"[৯] তিনি বিষয়টিকে শঙ্করাচার্যের বাণীর সঙ্গে তুলনা করে আরও বলেন - "সচরাচর যে অর্থটা বাহির হয় তৎসম্বন্ধে শঙ্কারাচার্যের এই বচনটি খাটে -

অর্থমনর্থং ভাবয় নিতং
নাস্তি তত: সুখলেশ: সত্যম।"[১০]

অর্থাৎ অর্থকে অনর্থ বলে জানলে তাতে সুখ ও সত্য কোনোটাই থাকে না।

তাই প্রাথমিকভাবে শিশুর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা হওয়া দরকার বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তাতে ভাব ও ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য সহজে হয়। শিশুর মাতৃভাষার প্রতি আগ্রহ বাড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তৎকালীন সমাজের ন্যায় বর্তমান সমাজেও এইপ্রকার সমস্যা দেখা যায়। বর্তমানেও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। "বর্তমান শিক্ষা এতটাই প্রয়োজনিক, অত্যধিক সুযোগসন্ধানী যা মানুষকে বাঁচার আনন্দ টুকুও দিতে পারে না।"[১১] বর্তমানে প্রায় অধিকাংশ উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালীরা তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎজীবন নিশ্চিত করতে ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। ফলত প্রাথমিক স্তর থেকেই তারা ইংরাজী ভাষাটিকে প্রধাণত রপ্ত করতে চায় এবং মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে প্রায়শই সমস্যার সম্মুখীন হয়। সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের অনীহা দেখা যায়। অন্যদিকে, ইংরাজীভাষা কে সম্পূর্ণরূপে রপ্ত করতে না পারায় অধিকাংশ বাংলা মাধ্যমে পঠন-পাঠনরত ছাত্র-ছাত্রীরা হীনমন্যতার স্বীকার হয়। তাই প্রাথমিকস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুশিক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। এতে উক্ত সমস্যাটির সমাধান হয় বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। যদিও ইংরাজী ভাষার গুরুত্বকে তিনি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেননি কখনও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, প্রাকৃতিক পরিবেশের শিক্ষা, সাবলীল পাঠ্যক্রম, শিক্ষকের ভূমিকার পাশাপাশি নারী শিক্ষার উপর রবীন্দ্রনাথ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার সার্বজনীনতা রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শনে পরিলক্ষিত হয়। যদিও বিভিন্ন আপত্তি ওঠে, রবীন্দ্র দর্শন সম্পূর্ণরূপে ত্রুটি মুক্ত নয়।

---

[৯] তদেব, পৃ.৯।

[১০] তদেব, পৃ.৯।

[১১] চট্টোপাধ্যায়, সমীর, বিবিধ প্রসঙ্গ বিষয় রবীন্দ্রনাথ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫,পৃ.৪৭।

তৃতীয় অধ্যায়

কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাদর্শন

কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষা দর্শনের মূল লক্ষ্য হল প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা। যেখানে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি অনুভূতিপ্রবণ, স্বাধীন, সংস্কারমুক্ত, বুদ্ধিসম্মত জ্ঞান নিয়ে ভয়শূন্য ভাবে জগতে বসবাস করতে সক্ষম। তাঁর মতে, শিক্ষার মাধ্যমে কয়েকটি পরীক্ষায় পাশ করে, জীবিকা অর্জন করে জগতে স্থায়ী এবং সুনিশ্চিতভাবে বসবাস করা, শিক্ষার মূল লক্ষ্য নয়। জীবনের বিস্তার অনন্ত, অতল। তাই শুধুমাত্র জীবিকা অর্জনের জন্য শিক্ষা অর্জন করা হলে, জীবনের মূল লক্ষ্যটি থেকে বিচ্যুত হতে হয়। জীবিকা জীবনে অবশ্যই জরুরী। কিন্তু শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়াটি জীবনের প্রধান লক্ষ্য কখনই নয় এই বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করা দরকার।

> *"So observe this whole phenomenon of life: getting a job, having a family, sex, pleasure, fear, pain, despair, anxiety, deepening sorrow, the enormity of all this, the complexity of all this. Just observe, not coldly as a scientist does through a microscope, but observe with tremendous passion."* [১]

শুধুমাত্র গণিত, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল কিম্বা অন্য কোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে দক্ষতা অর্জনের থেকে জীবনকে উপলব্ধি করা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে ছাত্রদের নিজেদের প্রশ্নটি করা প্রয়োজন কেন তারা শিক্ষিত হতে চাইছে? এই তথাকথিত শিক্ষার অর্থ কী? তথা জীবনের অর্থ কী? - কৃষ্ণমূর্তির মতে, প্রশ্নগুলি ছাত্র, শিক্ষক, পিতা-মাতা তথা জগতের সমস্ত মানুষের জন্যই বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাঁর মতে, শিক্ষার অর্থ শুধুমাত্র শিক্ষাকেন্দ্র থেকে, পাঠ্যপুস্তক থেকে কিছু তথ্য আহরণ করা নয় বরং সেটি সত্য না মিথ্যা সেটি বিচার করা দরকার। প্রকৃতিকে অনুভব করা প্রয়োজন।

---

[১] Krishnamurti, J, Why are you being educated?, Krishnamurti Foundation India, 2018, p. 36.

"Education is not only learning from books, memorizing some facts, but also learning how to look, how to listen to what the books are saying, whether they are saying something true or false. Education is not just to pass examinations, take a degree and a job, get married and settle down, but also to be able to listen to the birds, to see the sky, to see the extraordinary beauty ..... touch with them."[২]

তাছাড়া শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে শিক্ষিত হয়ে একজন ছাত্র এক সঙ্গে ক্রুদ্ধ, ঈর্ষাপরায়ন, উচ্চাকাঙ্খী এবং হতাশা গ্রস্থ হয়। অন্যদিকে, সমাজে সর্বক্ষনই বিশৃঙ্খলা এবং জাতিবিরোধ ঘটতে থাকে। এক্ষেত্রে একজন ছাত্র শিক্ষিত হয়েও নিজের নিরাপদ থাকাটাই শ্রেয় বলে মনে করে। শিক্ষা বলতে কি এটাকেই বোঝায়? যান্ত্রিকশিক্ষায় পারদর্শী হলেও একজন ছাত্র সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বদা দ্বন্দ্বে থাকে বলে কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন। তিনি বলেন যন্ত্রবিদ্যা একটি বৃহৎ সমাজ তৈরী করলেও একটা ভালো সমাজ তৈরী করে না। ভালো সমাজ বলতে শৃঙ্খলাকে বোঝায়, যার অর্থ কখনই নিয়মানুবর্তিতা নয়। তাই একজন ছাত্রকে অনুভূতি প্রবণ হতে হবে। অতি সূক্ষ্মভাবে বিষয়গুলি চিন্তা করতে হবে। একজন ছাত্রকে নিজ অভ্যন্তরীন বিষয়গুলিকে উপলব্ধি করতে হবে এবং একই সঙ্গে বাহ্যিক দিকের কর্মটিতেও দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

অনুভূতি বুদ্ধি ও স্বাধীনতা দ্বারাই আসে। শুধুমাত্র স্বাধীনতা থাকলেই হবে না তার মধ্যে শৃঙ্খলাটি থাকা প্রয়োজন। শিক্ষা মেধার উন্মেষ ঘটায়। আর মেধা হল এক প্রকার শক্তি যা একজন ব্যক্তিকে ভয়শূন্য হয়ে চিন্তা করতে সক্ষম করে। কিন্তু যেকোনো ধরনের উচ্চাকাঙ্খা উদ্বেগ ও ভয় আনে। এইরূপ উচ্চাকাঙ্খা কোনোদিনই একটি স্পষ্ট, স্বচ্ছ মেধা সম্পন্ন মনের জন্ম দেয় না। আমাদের জীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভয় বর্তমান থাকে। পরীক্ষায় পাশ করবার ভয়,চাকরি হারানোর ভয়, মৃত্যুকে ভয় তথা জীবনকে ভয়। এখন প্রশ্ন হল ভয়শূন্যভাবে জীবনে থাকা যায় কীনা? কৃষ্ণমূর্তির মতে জগৎ আসলে সুন্দর এবং সৌন্দর্য্যময়। তাঁর মতে আমরা প্রতিনিয়ত জগৎকে শ্রীহীন বস্তুতে পরিণত করে থাকি।

---

[২] Krishnamurti, J, On Education, Krishnamurti Foundation India, 2018, p. 7.

অনুভবের দ্বারা এর সৌন্দর্য গভীরতা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। শিক্ষা কোনকিছুকে অনুকরণ করা নয়, অনুসন্ধান করা। তাঁর মতে আমাদের সমাজ, পরিবার, শিক্ষক সকলেই একটি শিশুকে এই সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চলার যান্ত্রিক শিক্ষা দিয়ে থাকে। আর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি শিশু সেগুলি পালন করতে থাকে। কারণ এটি মেনে নেওয়া সহজ এবং সুরক্ষিত। কিন্তু এর মধ্যে ভয় বর্তমান থাকে। তাই এটি বেঁচে থাকা নয়। তাই জীবনে বেঁচে থাকার অর্থটি একজন শিশুকে নিজেকে উপলব্ধি করতে হয়। আর সেটি সম্ভব হয় সম্পূর্ণ স্বাধীনতার মাধ্যমে।

কৃষ্ণমূর্তির মতে সমগ্র জগৎ রাজনীতিবিদদের দ্বারা পরিচালিত হয়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পুলিশ, উকিল, মিলিটারি ইত্যাদি অসংখ্য উচ্চাকাঙ্খী মানুষ জগতে বসবাস করেন। এরা সকলেই উঁচুতে উঠতে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেন। সমগ্র জগতে মানুষ এই উচ্চাসনের লক্ষ্যে উন্মত্ত। একদিকে সাম্যবাদীরা লড়ছে পুঁজিবাদীদের সঙ্গে আবার সমাজবাদীরা দুজনকেই বাধা দিচ্ছে। ধর্মে ধর্মে হানাহানি হচ্ছে। অর্থাৎ সবাই সবার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ফলত পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস, ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, পৃথক রাষ্ট্রের এই প্রকার বিদ্বেষে পৃথিবীর শান্তি ব্যহত হচ্ছে। আর এই পৃথিবীতেই মানিয়ে চলবার জন্য ছাত্রদের প্রতিনিয়ত শিক্ষিত করা হচ্ছে, যা শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ থেকে বিচ্যুত।

তাই কৃষ্ণমূর্তির মতে, একটি ছাত্রের কর্তব্য শিক্ষিত হয়ে সমাজের দ্বন্দ্ব বিভেদগুলি দূর করে শান্তিময় সমাজ গঠন করা। তাই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে ছাত্রদের অবশ্যই উক্ত বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে এবং নিজেকে প্রথমে শর্তমুক্ত হতে হবে, একজন মুসলিম বা একজন ক্যাথলিক হিসাবে কখনই নয়। এটি বুদ্ধির একটি বৈশিষ্ট্য যেখানে, একজন ব্যক্তি সচেতনরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারে যে, শর্তাধীনতা এবং পূর্ব সংস্কারের ফলাফল গুলি কিরূপে বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক, জাতিভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক বিভাজন সৃষ্টি করে সমাজে।

কৃষ্ণমূর্তি বলেন "This is the factor of intelligence, becoming aware that one is conditioned, then seeing the effect of that conditioning in the world, the divisions, nationalistic, linguistic and so on and seeing that where there is division there is conflict."[৩]

সুতরাং বিভেদ থেকেই বিভিন্নপ্রকার দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং বুদ্ধি (Intelligence)-র সাহায্যেই এটা উপলব্ধ হয় বলে কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন। এখন প্রশ্নটি হল, কীরূপে একজন ছাত্র সংস্কার মুক্ত হবে? সংস্কারহীন হতে হলে মনকে অবশ্যই সংস্কার মুক্ত হতে হয়। এক্ষেত্রে অপর ব্যক্তির বক্তব্যের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে সচেতনতার সঙ্গে বিষয়টি প্রাথমিক ভাবে নিজে উপলব্ধ করাটিকে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন।

সাধারণত প্রতিটা মানুষের মন শর্তাধীন হয়। মানুষ কিছু নির্দিষ্ট শর্ত (Condition) মেনে তার কর্মগুলি করে। পূর্ব শর্তগুলি নির্দিষ্ট কিছু কর্মের ইঙ্গিত দেয়। শর্তাধীন হয়ে মানুষ শর্তের বাইরে কোনোরকম কর্ম করেনা। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, মন যেটি শর্তাধীন হয় সেটি আসলে কিরূপ? এটি কি স্থির থাকবে নাকি শর্তের বাইরে যাবে অথবা শর্তহীন হতে থাকবে? এবং এর থেকে মুক্ত হতে হলে তার উপায়টি ঠিক কি রকম? কৃষ্ণমূর্তির মতে, এটির উত্তর খুঁজতে আমাদের বুদ্ধির অনুশীলন করতে হয়।

তাঁর মতে, শর্তহীন হতে হলে, আমরা কখনই এমন একজন ব্যক্তিকে অনুসরণ করব না যিনি বলেন - 'এটা করো', 'ওটা করো'। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজে শর্তাধীন তিনি তাঁর শর্তগুলি অনুসরণ করে কিছু নির্দিষ্ট কর্মেরই আদেশ দেন। তাই শর্তহীন হতে হলে একজন ছাত্রকে অবশ্যই প্রথমে খুঁজে দেখতে হবে যে, সে কেন শর্তাধীন। তিনি বলেন, একটি শিশু একটি নির্দিষ্ট দেশে, একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে এবং একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতিতে বড় হয়ে ওঠে। সে তার পিতা-মাতা কে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পর্যবেক্ষণ করে। সে তার পিতা-মাতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তার পিতা-মাতার ধর্ম হিন্দু, মুসলিম অথবা কমিউনিষ্ট বা Capitalists হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিটি পিতা-মাতা তার সন্তানকে শেখায় 'এটা করো', 'ওটা করোনা'।

---

[৩] Ibid, p. 7.

অর্থাৎ কিছু নির্দিষ্ট কর্ম শিশুটির জন্য ছেলেবেলা থেকেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। শিশুটিকে সেই কর্মের গন্ডির বাইরে অন্য কোনো প্রকার কর্ম করার অনুমতি দেওয়া হয়না। উদাহরণ স্বরূপ ধরাযাক্ শিশুটির ঠাকুমা দৈনিক মন্দিরে যান এবং সমস্তরকম ধর্মীয় আচরণগুলি পালন করেন। এক্ষেত্রে শিশুটির শৈশব অবস্থা থেকে সে সেগুলি দেখে এবং ক্রমে ক্রমে সেগুলি মেনে নেয়। আবার যদি কোনো পিতা-মাতা কোনোরকম ধর্মীয় প্রথা না মানেন তখন শিশুটিও সেটার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়। সাধারণত শিশুর মন ও মস্তিষ্ক কাদার মত হয়। সেই কাদায় অবিরত ছাপ পড়তে থাকে। যেমন একটি রেকর্ডে খাঁজ পড়ে। কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন "The simple fact is that the mind, the brain of the child is like putty or clay and on that putty, impressions are made, like the grooves in a record. Everything is registered."[৪]

সুতরাং সমস্ত কিছু শিশুটির মনে সচেতন বা অচেতন ভাবে নথিভুক্ত হতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শিশুটি ক্রমে একজন হিন্দু বা মুসলিম বা ক্যাথলিক বা একজন নাস্তিকে পরিণত না হয়। বিষয়টি সম্পর্কে শিশুটি সবসময়ে সচেতন থাকেনা। কোনো বিশেষ একটি ধর্মে শর্তাধীন হয়েই মানুষ পৃথক হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন "So in a child everything is registered consciously or unconsciously, unitl gradually he becomes a Hindu, Muslim, Catholic or a non-believer."[৫]

তিনি আরও বলেন "He then makes divisions ..... Good."[৬]

অর্থাৎ কোনো বিশেষ ধর্মে ধর্মাবলম্বী হয়েই তারপর শিশুটি বিভাজন করতে শুরু করে। যেমন আমার ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, আমার বিশ্বাস, তোমার বিশ্বাস, আমার দেশ, তোমার দেশ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

---

[৪] Ibid, p. 24.
[৫] Ibid, p. 24.
[৬] Ibid, p. 24.

ছাত্রটি যদি হিন্দু হয় তাহলে, ছাত্রটিকে নিজেকে প্রত্যক্ষ করতে হবে যে, একজন হিন্দু হিসাবে সে শর্তাধীন। তাকে মন্দিরে যেতে হয়। তাকে মন্ত্রপাঠ করতে হয়। 'এটা' সে বিশ্বাস করে এবং 'অন্যটি' করে না বা করতে চায়না এবং এই সমস্ত বিষয়টি সম্পর্কে সে আত্মসচেতনও। এখন একজন ছাত্র সচেতন ও সে নিজের থেকে জানে যে সে সত্যই শর্তাধীন। তাহলে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রশ্নটি এরূপ হবে যে, সে শর্তহীন হতে চায় কিনা এবং শর্তহীন হতে চাওয়াতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শর্তাধীন হওয়াতে ভুলটা ঠিক কোথায়? বা কেন ছাত্ররা শর্তহীন হবে? কারণ একজন ব্যক্তি হিন্দু হিসাবে বা একজন ব্যক্তি মুসলিম হিসাবে শর্তাধীন। এটি আসলে ক্ষতিকারক। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এক্ষেত্রে আদতে কী ক্ষতি হয়? তারা একইসঙ্গে তাদের শর্ত, আদর্শ, বিশ্বাসগুলি নিয়েও বসবাস করতে পারে। অর্থাৎ দুটি ভিন্ন ধর্মের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস নিয়ে একই পথে থাকতেই পারেন। বিভেদটা তাহলে ঠিক কোথায়? যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মভিত্তিক বিভেদ রয়েছে সেখানে দ্বন্দ্ব বর্তমান। তাঁর মতে, শর্ত হল আসলে বিভেদের একটি কারণ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমাদের দেশে প্রায়শই হিন্দু-মুসলিম অথবা অন্য ধর্মের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধে। ধর্মে ধর্মে হানাহানি হয়ে মানুষ হত্যা হয়। ধর্মীয় কারণে এসমস্ত হানাহানির প্রভাব পড়ে আমাদের সমাজে। এসমস্ত দ্বন্দ্ব হয় কারণ এক্ষেত্রে বিভেদটি বর্তমান। 'আমি মুসলিম', 'তুমি হিন্দু', এই বিভেদটাই মানুষে মানুষে বিদ্বষ তৈরী করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও বিষয়টি ভিন্ন নয়।

শর্তাধীন হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন -

"Why are you prejudiced? Because part of your conditioning is to be prejudiced, and in prejudice there is a great deal of comfort, a great deal of pleasure".[৭]

---

[৭] Ibid, p. 26.

অর্থাৎ পূর্ব সংস্কারের মধ্যে দিয়ে জীবন যাপনে আরাম, আনন্দ বর্তমান। এগুলির মধ্যে দিয়ে মানুষ একটি নিশ্চয়তার জীবন পায়। শিক্ষাক্ষেত্রেও অনেকসময় বিষয়টি ভিন্ন নয়। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কেবলমাত্র বই এর তথ্যগুলি মুখস্থ করে, পরীক্ষায় পাশ করে একটি ছাত্র নিশ্চয়তার জীবিকা অর্জন করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে একজন ছাত্রের শিক্ষিত হয়েও প্রশ্ন করার ক্ষমতাটি হারিয়ে যায়। এগুলির মধ্যে দিয়ে মানুষ একটি নিশ্চয়তার জীবন পায়।

এছাড়া শর্তহীন হওয়ার পাশাপাশি আমাদের চারপাশের প্রকৃতিকেও উপলব্ধি করতে হবে। একজন ছাত্রকে সচেতন হতে হবে মাটির সৌন্দর্যের প্রতি, উদ্ভিদের রং, ছায়া, আলোর গভীরতা ও পাখিদের প্রতি। অর্থাৎ একজন ছাত্রকে তার পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছুর প্রতিই সংবেদনশীল হতে হবে। একজন ছাত্রকে চিন্তা করতে হবে যে, সে তার বন্ধু বা তার পরিচিত অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের সময় ঠিক কিরূপ আচরণ করে থাকে। কৃষ্ণমূর্তি বলেন "Now, look at the trees, at the hills, the shape of the hills, look at them, look at the quality of their colour, watch them. Do not listen to me."[৮]

অর্থাৎ জগতের প্রতিটি বস্তুকে, একজন ছাত্রকে দেখতে হবে মন ও চোখ দিয়ে। গাছ, পাহাড়ের আকৃতি, রঙের গুণ সমস্ত কিছুই মন দিয়ে অনুভব করতে হবে। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন দুটি দিক থেকেই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে হবে। শান্তরূপে অনুভব করতে হবে তার অভ্যন্তরে কী কী ঘটছে সেটি দেখার পর। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার চিন্তা বাধা সৃষ্টি করে কর্মটিতে। এটি করতে পারলে একজন ছাত্র অবশ্যই অনুভূতিশীল হবে। আর তখন সে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ দুটি ক্ষেত্রেই বিশেষরূপে সচেতন হবে। ছাত্রটি উপলব্ধি করবে তার বাহ্যিক দিকটাই তার আভন্তরীণ দিক এবং দুটি বিষয় সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন। তাহলে যে প্রত্যক্ষ করছে এবং যা প্রত্যক্ষ করছে দুটি-এক হবে। সেক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকই হয় পর্যবেক্ষণ।

---

[৮] Ibid, p. 26.

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণত ঐতিহাসিক, গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক, ভৌগলিক, ভাষাভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করে থাকি। কৃষ্ণমূর্তির মতে জ্ঞান তিন প্রকার। (১) বৈজ্ঞানিক (২) সামগ্রিক এবং (৩) ব্যক্তিগত জ্ঞান। তিনি বলেছেন "There are these three kinds of knowledge scientific, collective, personal".[৯] অর্থাৎ আমরা তিন প্রকারে জ্ঞান লাভ করে থাকি। একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সামগ্রিক জ্ঞান রূপে সমস্ত কিছু থেকে একপ্রকার জ্ঞান আমার হয় এবং এই সমস্ত জ্ঞান থেকে অভিজ্ঞতার দ্বারা আমার নিজস্ব একপ্রকার ব্যক্তিগত জ্ঞান হয়। এখন প্রশ্ন ওঠে, এই তিনটি প্রকারে লব্ধ জ্ঞান সামগ্রিক ভাবে কী বুদ্ধি জোগায়? অথবা প্রশ্ন উঠতে পারে জ্ঞান কি? এবং জ্ঞান কি বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, বুদ্ধি জ্ঞানকে ব্যবহার করে। বুদ্ধির স্বচ্ছ রূপে, বস্তুগত রূপে, চিন্তার ক্ষমতা থাকে। কৃষ্ণমূর্তি বলেন "Intelligence is the quality of the mind that is very sensitive, very alert, very aware. ..., but is capable of thinking very clearly, objectively".[১০]

অর্থাৎ বুদ্ধি এমন একটি অবস্থা যেখানে কোনো প্রকার ব্যক্তিগত মতামত, অনুভূতি এবং পূর্বপ্রথা স্থান পায়না। 'বুদ্ধি' বলতে কৃষ্ণমূর্তি Direct understanding - কেই বুঝিয়েছেন।

বুদ্ধি হল মনের একটি গুণ যা বিশেষ অনুভূতিপ্রবন, সচেতন ও সজাগ। বুদ্ধি স্পষ্টরূপে চিন্তা করতে সক্ষম এবং এটি কোনো কিছুর সঙ্গে জড়িত নয়। কৃষ্ণমূর্তির মতে জগতে মানুষ বিভিন্ন প্রকার শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত হয়ে বসবাস করে। কোনো একটি ছাত্রের হয়ত গণিত অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যথেষ্ট জ্ঞান থাকে, ভালো একটি ডিগ্রী থাকে এবং সেই ছাত্রটি একজন প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারও হয়। কিন্তু এখন প্রশ্নটি হল, ছাত্রটি একই সঙ্গে অনুভূতি প্রবণ ও সচেতনও হয় কিনা সেটি দেখা বিশেষ প্রয়োজন। অর্থাৎ ছাত্রটি বস্তুগত

---

[৯] Ibid, p. 20.

[১০] Ibid, p. 21.

ভাবে বুদ্ধি এবং understanding সহ চিন্তা করতে সক্ষম কিনা অর্থাৎ একজন ছাত্রের জ্ঞান ও বুদ্ধির মধ্যে ঐক্যটি আছে কিনা বা জ্ঞান ও বুদ্ধির মধ্যে কোনোরকম সামঞ্জস্য আছে কীনা সেটা দেখা প্রয়োজন বলে কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন। এপ্রসঙ্গে ছাত্রদের তিনি প্রশ্ন করেন -

"Are you thinking objectively, clearly with intelligence, understanding? Is there harmony between knowledge and intelligence, a balace between the two?"[১১] - প্রশ্নটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ জ্ঞান ও বুদ্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য (harmony) থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। সচেতনতার সাথে একজন ছাত্রকে অনুভূতিপ্রবণ হয়ে বিষয়টি স্পষ্টরূপে চিন্তা করা প্রয়োজন। বুদ্ধির থেকে একজন ছাত্র শুধুই পর্যবেক্ষণ করেনা, অনুভবও করে জগৎকে। তাই তিনি বলেছেন "Intelligence implies that you see the beauty of the earth, the beauty of the trees, the beauty of the skis, the lovely sunset, the stars, and the beauty of the subtiety."[১২]

এখন প্রশ্ন হল, আমাদের দেশের ছাত্ররা কী এইপ্রকার বুদ্ধি তাদের বিদ্যালয় থেকে, পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জন করে কিনা। নাকি শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয় থেকে জ্ঞান আহরণ করে। কৃষ্ণমূর্তির মতে, যদি একজন ছাত্র কোনো প্রকার বুদ্ধি বা অনুভূতি ছাড়াই জ্ঞান সংগ্রহ করে, তখন সেই জ্ঞানটি ভীষণরকম ভাবেই বিপদজনক হয়। বলাবাহুল্য এইপ্রকার অনুভূতিহীন জ্ঞান ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ধরা যাক্ একজন ব্যক্তি পারমাণবিক বোমা তৈরির বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন কোনোরকম অনুভূতি ছাড়াই এবং সেক্ষেত্রে তিনি এই জ্ঞানটিকে হয়ত ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করতে পারেন। কৃষ্ণমূর্তি বলেন - "This is what the whole world is doing".[১৩] অর্থাৎ সমগ্র

---

[১১] Ibid, p. 21.
[১২] Ibid, p. 21.
[১৩] Ibid, p. 21.

জগৎ বর্তমানে এটাই করে চলেছে, যা আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষ্য কখনই নয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বুদ্ধি (intelligence) ছাড়া একজন ব্যক্তির জ্ঞান (knowledge) সবক্ষেত্রেই বিপদজনক হয় কিনা? অথবা আপত্তি উঠতে পারে যে, বুদ্ধি ছাড়া একজন ব্যক্তির জ্ঞান মঙ্গলময় কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা? তাই একথা বলার কোনো কারন নেই যে বুদ্ধি ছাড়া জ্ঞান সর্বদা ধ্বংসাত্মক কর্মের কারন। অন্যদিকে, এ প্রশ্নও ওঠে যে, একজন ব্যক্তির জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত নাকি যুক্ত নয় সেটি নির্ধারিত হয় কিরূপে? উত্তরে বলা যায়, একজন ব্যক্তির জ্ঞান বুদ্ধিসম্মত হলে ব্যক্তিটি বিশেষরূপে সচেতন এবং অনুভূতি প্রবণ হবে বলে মনে করেন।

অতএব একটি ছাত্র বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে না, যেটি বুদ্ধির থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত। বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান একজন ছাত্রকে অনুভূতি প্রবণ করে, স্পষ্টরূপে চিন্তা করতে সমর্থ করে এবং এইপ্রকার জ্ঞান সমাজের জন্য মঙ্গলময় বলে কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন। শিক্ষার মাধ্যমে এই প্রকার জ্ঞান লব্ধ না হলে একটি ছাত্রের শিক্ষিত হওয়াটি আদতে অর্থহীন বলেই তিনি মনে করেন। এই প্রকার বুদ্ধিসম্মত জ্ঞান লাভ করে একজন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয় - যা শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য একটি অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাদর্শনের তুলনামূলক আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তি দুজনেই শিক্ষাকে বৃহৎ অর্থে গ্রহণ করেছেন। এঁরা দুজনেই শিক্ষাকে জীবন থেকে পৃথক করে দেখেননি। রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রকৃত শিক্ষার অর্থ হল তাই যা, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার দ্বারা সৃজনশীলতা ও সৌন্দর্য্যবোধ কে উপলব্ধি করতে শেখায় এবং ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে মানব জীবনে পরিপূর্ণতা আনে। ঔপনিবেশিক গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ একথা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তিনি উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে সাবলীল পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার মাধ্যমে শিশুর মানসিক এবং শারীরিক বিকাশের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি কলের শিক্ষা নয় বোধের শিক্ষাকে স্থান দিয়েছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মাচর্যাশ্রমে এবং পরবর্তীকালে এটির বৃহৎ লক্ষ্যে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন।

অন্যদিকে কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন প্রকৃত শিক্ষার অর্থ কখনই পরীক্ষায় পাশ করে, জীবিকা অর্জন করে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, সুনিশ্চয়তায় জীবন যাপন করা নয়। প্রকৃত শিক্ষা হল তাই যার মাধ্যমে একজন শিশু তার সমস্ত পূর্বসংস্কারগুলি থেকে মুক্ত হয়ে, ভয়শূন্য মন নিয়ে, সংবেদনশীল হয়ে প্রকৃতি তথা জগতের সমস্ত বস্তুকে উপলব্ধি করতে পারে এবং সামাজিক হিংসা, বিদ্বেষগুলি দূর করে সমাজের রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাদর্শন একটি অন্যটির পরিপূরক। যদিও কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য বর্তমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কৃষ্ণমূর্তি শিক্ষা দর্শনে একজন শিশুর মনস্তাত্ত্বিক (psychological) দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বোধের শিক্ষার মাধ্যমে একটি শিশুর আত্মবিকাশের কথা বলেছেন। আর কৃষ্ণমূর্তি একজন শিশুর আত্ম উপলব্ধির মাধ্যমে তার সমস্ত পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় সংস্কার গুলি থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে শান্তিময় সমাজ গঠনের কথা বলেছেন । দুজনেই উন্মুক্ত প্রকৃতির মাধ্যমে শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রকৃতি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং কৃষ্ণমূর্তির ঋষি ভ্যালি বিদ্যালয়েও উন্মুক্ত প্রকৃতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্র স্বাধীনতা, সাবলীল পাঠ্যক্রম, আচরণ শিক্ষা এবং শিক্ষকের ভূমিকাটির উপর দুজনেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাহলে তফাৎটা কোথায়? দুজনেই এক আদর্শ শিক্ষার কথা বলেছেন যা জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন যদিও কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষা দর্শনে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উহ্য থাকেনি। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উপর বিস্তারিত আলোচনা

করেছেন, যা কৃষ্ণমূর্তি শিক্ষা দর্শনে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়নি। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, রবীন্দ্র দর্শনে চেতনার স্তরগুলির সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং 'ছোট আমি' থেকে 'বড় আমি'তে উত্তরণের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে কৃষ্ণমূর্তির দর্শনে, একজন শিশুর নিজের মধ্যেই তার মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির বিকাশ ঘটিয়ে সমস্ত রকম হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থসত্তাকে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্র দর্শনে 'অহংকে' পরিত্যাগ করে, স্বার্থ সত্তাগুলি ত্যাগ করে পরমাত্মায় একত্ব হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে কৃষ্ণমূর্তি আপন স্বার্থসত্তাগুলি ত্যাগ করে উত্তম আচরণ, ভাল ব্যবহার, অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলেছেন। কৃষ্ণমূর্তির কাছে অস্তিত্বের প্রধান লক্ষণই হল সম্পর্কে থাকা, সম্পর্কিত থাকা, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করা। তাঁর মতে, শিক্ষিত মন চিন্তা করে, শোনে, প্রশ্ন করে এবং সক্রিয় হয়ে সমাজে আনন্দ সহকারে বসবাস করে। রবীন্দ্র দর্শন এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষা দর্শনের তুলনা করলে মূলত সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষা ভাবনায় শিশুর মনস্তাত্ত্বিক দিকটির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা রবীন্দ্র দর্শনে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়নি। যদিও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিশু মনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণমূর্তি একজন শিশুর মনস্তাত্ত্বিক দিকটির অতি সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, যার দ্বারা একজন শিশু শৈশব অবস্থা থেকেই সংবেদনশীল, মেধাসম্মপন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত, স্বাধীন, স্বতন্ত্র একজন ব্যক্তি হয়ে ওঠে। যে সমাজের হিংসাত্মক দিকটির রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিশুর আত্মবিকাশের এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের কথা বলেছেন। যার দ্বারাই একজন ব্যক্তি যথাযথ পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবে। যে জগতের সমস্ত কিছুর সঙ্গে সামঞ্জস্য (Harmony) বিধান করবে। তখন সে তার 'অহং' থেকে মুক্ত হয়ে বড় আমিতে উত্তীর্ণ হয়ে পরম ঐক্য (Deeper Unity) লাভ করবে। অর্থাৎ 'ছোট আমি' 'বড় আমি'-র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে। জগতের প্রতিটি ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে সে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সমস্ত কিছুকে উপলব্ধি করবে। ব্যক্তিসত্তা পরমসত্তাতে মিলিত হয়ে আনন্দ লাভ করবে। পরম সত্য (Truth) কে উপলব্ধি করবে -- বলাবাহুল্য যা রবীন্দ্রদর্শনেরও অন্যতম মূল বক্তব্য।

প্রতিটি মানুষের 'ছোট আমি'-র সংকীর্ণ স্বার্থসত্তাটি তার 'বড় আমি'-তে উত্তীর্ণ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু মানুষ যখন তার সংকীর্ণ স্বার্থসত্তা থেকে মুক্ত হয় এবং বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হতে পারে, তখনই সে বড় আমিতে উত্তীর্ণ হয়। নিজের কল্যাণের পাশাপাশি অপরের কল্যাণের কথা চিন্তা করে। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যাটি হল, প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে একজন ব্যক্তির ছোট আমি থেকে বড় আমিতে উত্তরণের বিষয়টির বাস্তবায়ন কি আদৌ সম্ভব? বা হলেও তা কতটা সম্ভব? এছাড়া প্রায়গিক দিক থেকে বিষয়টি বিচার করলে আরও বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঠিক কতটা প্রাসঙ্গিক? কিম্বা রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন কী একজন ব্যক্তির - আত্মোপলব্ধি (Self-Realization)-র দ্বারা জীবন তথা সমাজের মূল সমস্যাগুলি সমাধান করতে সক্ষম কিনা? - প্রশ্নগুলি ওঠে এবং এক্ষেত্রে বলা যায়, রবীন্দ্রাশিক্ষাতত্ত্ব উক্ত সমস্যাগুলির সমাধানের একটি সূত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্র শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী, শিক্ষাকে বর্তমান সমাজে রূপ দিতে হলে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় একথা সত্য। সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্র শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে

-- এটি একটি সমস্যা। আবার এই তথাকথিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে অধিকাংশ মানুষ ক্রমশ যান্ত্রিক, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, জীবনের মূল্যবোধকে হারিয়ে ফেলেছে এটিও আরেকটি বৃহৎ সমস্যা। এই জন্যই কি আমরা শিক্ষিত হচ্ছি? কারণ এইপ্রকার শিক্ষা ভীষণভাবে জীবিকা কেন্দ্রিক। এই প্রকার যান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতি অধিকাংশ মানুষ কে উচ্চাকাঙ্খী করে তোলে। তাই এইপ্রকার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রতিনিয়ত আমরা উচ্চাসনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাইছি কোনো প্রকার সন্তোষজনক মূল্যবোধ ছাড়াই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে লড়াই করছি, পৃথিবীর শান্তি ব্যাহত হচ্ছে এবং আদতে আমরা ভালো থাকছিনা। আর এই যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা এই প্রকার পৃথিবীতে মানিয়ে চলার জন্যই প্রতিনিয়ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করে তুলছে। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ কি শুধুই তাই? বোধ হয় না।

এখন এই সমস্যাটির সমাধান যদি খুঁজতে চাই তাহলে বলা যায়, বর্তমানে দেশজুড়ে শিক্ষা নিয়ে যে অব্যবস্থা এবং অরাজকতা চলছে তাতে রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন কিছু সমস্যার সমাধান নিশ্চিতরূপে দেয়। তার থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেয় এই শিক্ষাতত্ত্ব। তাই এই শিক্ষাতত্ত্বের কিছু আদর্শ যদি আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যুক্ত করা যায় তাহলে ক্ষতি কি? কারণ এই প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীদের যান্ত্রিকতাকে দূর করে, বিভিন্ন কর্মের মধ্য দিয়ে তাকে সৃষ্টির স্বাদ পাইয়ে দিতে সক্ষম। এই প্রকার শিক্ষাতত্ত্বের মধ্য দিয়েই ছাত্রছাত্রীরা নিজেকে আবিষ্কারের পথ খুঁজে পাবে। যদিও সব সমস্যাগুলির সম্পূর্ণরূপে সমাধান নিশ্চিতরূপে সম্ভবপর নাও হতে পারে। আবার এই প্রকার শিক্ষাদর্শন ভাবনাকে কেউ কেউ হয়ত বিশ্বমানবতারূপীও বলতে পারেন। তথাপি এইপ্রকার শিক্ষাদর্শনই আমাদের বিশেষরূপে কাম্য। কারণ প্রকৃত শিক্ষাই একজন মানুষকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে। বোধের শিক্ষা জীবন তথা জগতের সমস্ত কিছুর সঙ্গে মানুষের সমন্বয় সাধন করে। মানুষ, প্রকৃতি, বিশ্বজগতের সঙ্গে শিশুকে একাত্ম করে। রবীন্দ্র দর্শনের সমন্বয়-এর ভাবনাটি বোধের শিক্ষার মধ্য দিয়ে কার্যকরী হয়। তাই রবীন্দ্রনাথের বোধের শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর আত্মোপলব্ধির পথটি আবিষ্কার করা দরকার।

রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্ব পর্যালোচনা করে উক্ত সমস্যা গুলির সমাধানের ক্ষেত্রে মূল পশ্নটি হল কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্বে উল্লেখিত মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির উপর বিকাশ

ঘটিয়ে একজন শিশু সাবলীলভাবে রবীন্দ্রনাথের বোধের শিক্ষার মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম কিনা? - সেটি দেখা দরকার। কারণ কৃষ্ণমূর্তি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার সঠিক পরিকাঠামোর পাশাপাশি একজন শিশুর মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন। যদিও তার অর্থ কখনই এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথ শিশু মনকে অগ্রাহ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিশুমনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্র শিক্ষাতত্ত্বে একজন শিশুর নিজের থেকে তার মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির বিকাশের অভ্যাস (Practice) বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় নি। তাই মনে হয়, কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী, একজন শিশুর প্রাথমিক স্তর থেকেই, জীবন তথা সমাজের সমস্ত মূল্যবোধগুলিকে প্রশ্ন করা উচিত। সেগুলি সত্য না মিথ্যা তা যাচাই করা দরকার। তাকে সমস্ত সংস্কার, পূর্ব শর্ত (Condition), ভয় (Fear) থেকে মুক্ত থাকা দরকার। জাগতিক সমস্ত বিষয়ে তার সচেতন হওয়া প্রয়োজন। তাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে কোনপ্রকার উচ্চাকাঙ্খা ছাড়াই। কারণ উচ্চাকাঙ্খা বিখ্যাত হতে শেখায়। আর উচ্চাসনে উঠতে গিয়েই মানুষ স্বার্থপর (Selfish), হতাশা (Depression) গ্রস্থ, ভয় (Fear) যুক্ত এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ বিভাজন শুরু করে -- আমি হিন্দু, তুমি মুসলিম, আমার দেশ, তোমার দেশ ইত্যাদি ইত্যাদি। একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করে আর যা হিংসা ও যুদ্ধকেই আমন্ত্রণ জানায়। তাই একজন শিশুকে তার পিতা-মাতা, পরিবার, সমাজ, ধর্মীয়, রাজনৈতিক সমস্ত রকম বিশ্বাসগুলি থেকে প্রথমে মুক্ত হয়ে, জগতের সমস্ত কিছুকে মন ও চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে হবে। নীরবতার সঙ্গে প্রকৃতিকে অনুভব করলে, তার বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীন দিকটি এক হয়। আর তখন একজন শিশু সচেতন এবং সংবেদনশীল হবে। তখন সে সংস্কার মুক্ত, ভয়মুক্ত এবং স্বাধীন হবে, যে জীবনের প্রকৃত মূল্যবোধকে উপলব্ধি করবে। তাই একজন ছাত্রর স্বয়ং শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি উক্ত অভ্যাস (practice) গুলি করতে পারাটাই কাম্য। এরসাথে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু শিক্ষা ভাবনাকে যুক্ত করা যেতে পারে। যেমন পাঠ্যক্রমে সংগীত নৃত্যকলা, নাটক প্রভৃতি কে স্থান দিলে ভাল। আমরা চেষ্টা করতে পারি, যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক পরিবেশে বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, যাতে শিশুরা প্রকৃতির মাধ্যমে স্বত:স্ফূর্ত ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাঁধাধরা নিয়ম থাকা কাম্য নয়। এছাড়া একজন শিশুকে শুধুমাত্র জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষিত করা হবে না। শিশুর

চিন্তন ক্ষমতা বিকাশের দিকে বিশেষরূপে নজর দিয়ে প্রকৃতিকে অনুভব করার বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে। এর দ্বারা একাকীত্ববোধ, হিংসা, যান্ত্রিকতা গুলি দূর হতে পারে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিস্তারের ভাবনাটির উপর গুরুত্ব দিয়ে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল শিশুকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মূলত নিম্নবৃত্ত শিশুরা যাতে আর্থিক সঙ্কটের কারণে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয় বিষয়টি ভাবা দরকার। অন্যদিকে, বর্তমানে অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের ফলে মাতৃভাষার প্রতি তাদের প্রায়শই অনীহা দেখা যায়। তাই ইংরাজি ভাষার পাশাপাশি মাতৃভাষাতেও শিশুদের সাবলীল করে গড়ে তোলা দরকার। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষককে সহায়কের ভূমিকা পালন করাই কাম্য। এর ফলে শিশুরা প্রশ্ন করতে শিখবে, পাঠ্য বিষয় আগ্রহী হবে এবং স্বত:স্ফূর্ত ভাবেই তা গ্রহণ করবে। অর্থাৎ একজন শিশুকে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, যাতে তার শিক্ষাকে কখনই জীবনের থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে না হয়। তাই শুধু জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর জগতের সমস্ত কিছুর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করবে। তখন একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে। শিশুরা ভালোবাসতে শিখবে প্রকৃতিকে, মানুষকে, সর্বপোরি বিশ্ব জগৎকে। সমস্ত স্বার্থপরতা গুলি নির্মূল হবে। সম্পর্কিত সত্তার মধ্যে দিয়েই হিংসা দূরীভূত হতে পারে। এর ফলে ভারতবর্ষের মূল ঐতিহ্যকে স্থান দেওয়া যাবে। তখন ব্যক্তিসত্তা পরমসত্তায় উত্তীর্ণ হয়ে ঐক্য (Unity) লাভ করবে। তবে, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ব্যবহারিক চাহিদা গুলিকে সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষা করে কোন এক আদর্শ দ্বারা পরমসত্তায় উত্তীর্ণ হওয়া হয়ত আমাদের মত সংসারী মানুষের পক্ষে সহজতর নয়। কিন্তু অসম্ভবও নয়। কারণ প্রতিনিয়ত আমরা একটু একটু করে চেষ্টা করতে পারি আমাদের সংকীর্ণ স্বার্থগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে। আমাদের নিজের পরিবারকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়স্বজন, আমাদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে পারি। তাদের নানান সমস্যায় সহযোগিতা করতে পারি। যার মধ্যে দিয়েই আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সীমাকে অতিক্রম করে একজন সম্পর্কিত সত্তা হয়ে উঠতে পারি। নিজের ভালো থাকার পাশাপাশি অপরের ভালো থাকার বিষয়ে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উক্ত বিষয়টি পাশ্চাত্য দার্শনিক (দরদী নৈতিকতা) ক্যারল্ গিলিগান-এর ভাবনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ তিনিও একজন ব্যক্তির নিজের ভালো থাকার পাশাপাশি অন্যের ভালো থাকার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তিত্বের বিকাশের মাধ্যমে এটি

করতে পারলে নিজের ভালো থাকা এবং অন্যের ভালো থাকার মধ্যে দিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করার লক্ষ্যটি বাস্তবায়ন হতে পারে। আর প্রকৃত শিক্ষার মূল লক্ষ্য বোধহয় এটাই। তাই না?

তাই মনে হয়, কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্বে উল্লেখিত শিশুর মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) বিকাশের দিকটির উপর গুরুত্ব দিয়ে রবীন্দ্র শিক্ষাতত্ত্বের বোধের শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর আত্মবিকাশ ঘটানো সম্ভব হতে পারে। আর এই প্রকার যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একজন যথাযথ পরিপূর্ণ মানুষ তৈরী হবে। যে নিজের কল্যাণের পাশাপাশি সমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা করবে, জগতের প্রতিটি মূল্যবোধকে উপলব্ধি করবে। জগতের প্রতিটি ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে সে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সমস্ত কিছুকে উপলব্ধি করবে। 'ছোট আমি' 'বড় আমি'তে উত্তীর্ণ হয়ে সামঞ্জস্য (Harmony) লাভ করবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১৭।

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন (প্রথম খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২৩।

৩. ঠাকুর,রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন (দ্বিতীয় খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২৩।

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (পঞ্চদশ খন্ড),বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২।

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (অষ্টাদশ খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২০।

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২৮।

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২৬।

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২২।

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২৮।

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খন্ড), বিশ্বভারতী,কলকাতা, ১৪২২।

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োদশ খন্ড), বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪২২।

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্দশ খন্ড), বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪২৬।

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষোড়শ খন্ড), বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪২৭।

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ,কলকাতা, ১৪২১।

১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মানুষের ধর্ম ,বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ,কলকাতা, ১৪১৮।

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম ,বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,কলকাতা, ১৪১৬।

১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ইংরেজী সহজশিক্ষা (প্রথম ভাগ), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১৯।

১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ইংরেজী সহজশিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) ,বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪২১।

১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছেলেবেলা , বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪২৪।

২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, লিপিকা , বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪২৭।

২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪২৭।

২২. ঠাকুর,রবীন্দ্রনাথ, শেষলেখা , বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,কলকাতা, ১৪১৬।

২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যের পথে ,বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪২২।

২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী ,বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ,কলকাতা, ১৪১৯।

২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দাস, নীলা (অনুবাদ), সাধনা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ২০১৯।

২৬. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪২০।

২৭. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনকথা, আনন্দ, কলকাতা, ১৪২০।

২৮. পাল, প্রশান্তকুমার, রবিজীবনী, আনন্দ, কলকাতা, ১৪২০।

২৯. রায়, কমলিকা, রবীন্দ্রনাথের সাধনা বক্তৃতামালা একটি দার্শনিক বীক্ষা, কারিগর, কলকাতা, ২০১২।

৩০. রায়,ডাঃ কৃষ্ণা,রবীন্দ্র মননের কয়েকটি ধারা ,রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা ,২০২১।

৩১. ঠাকুর, সুপ্রিয়, ছেলেবেলার শান্তিনিকেতন, আনন্দ, কলকাতা, ২০১২।

৩২. সেন, প্রবোধ চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৭।

৩৩. দে,রামপ্রসাদ (সম্পাদক), রবিসন্ধ্যা (প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা), বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলকাতা, ২০০২।

৩৪. দে,রামপ্রসাদ (সম্পাদক), রবিসন্ধ্যা (চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা),বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলকাতা, ২০০৫।

৩৫. দে,রামপ্রসাদ (সম্পাদক), রবিসন্ধ্যা (দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা),বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলকাতা, ২০০৩।

৩৬. ঘোষ, অমরনাথ, রবিসন্ধ্যা বক্তৃতামালা, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ,কলকাতা, ১৯৯৫।

৩৭. সাহা,কার্তিক, রবিসন্ধ্যা বক্তৃতামালা , বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ,কলকাতা, ১৯৯৯।

৩৮. নন্দ,ডঃ বিষ্ণুপদ (সম্পাদক), বিবিধ প্রসঙ্গ বিষয় রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা বিভাগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ,কলকাতা ,২০১৫।

৩৯. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, রবিবাসর বার্ষিক সংখ্যা ৪৫, রবিবাসর, কলকাতা, ১৪২০ ।

৪০. দাশগুপ্ত, সতীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী, বিশ্বভারতী , কলকাতা, ১৪০৭।

৪১. দে, সন্তোষকুমার , রবিবাসর, বেঙ্গল বুকস , কলকাতা, ১৩৯৬।

৪২. দে, রমাপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ,বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, কলকাতা, ২০১০।

৪৩. বণিক, নন্দদুলাল, রবীন্দ্রমনন, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ,কলকাতা, ১৪১৬।

৪৪. মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় ও আশ্রম,গাঙচিল ,কলকাতা ,২০১৫।

৪৫. রায়,সত্যেন্দ্রনাথ (সম্পাদনা), রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা , ১৪১৭।

৪৬. বন্দ্যোপাধ্যায় ,হরিচরণ ,রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ , বিশ্বভারতী , কলকাতা, ১৪০৬।

৪৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৪১৫।

৪৮. চন্দ, রানী ,সব হতে আপন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ,কলকাতা, ১৪১৭।

৪৯. দাস, সমর, বিশ্বদরবারে নানারূপে রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, ১৪১৭।

৫০. মুখোপাধ্যায়, ডঃ বিমলকুমার, রবীন্দ্রনন্দনতত্ত্ব, দে জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭।

৫১. বসু , বিষ্ণু , মিত্র, অশোককুমার (সম্পাদনা), নানা জনের রবীন্দ্রনাথ , পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১১।

৫২. ঘোষ, জ্যোতির্ময়, রবীন্দ্রমনন ও প্রগতিসংস্কৃতি , দে জ পাবলিশিং , কলকাতা, ১৪১৭।

৫৩. চক্রবর্তী , সুমিতা, বসিরুদ্দোজা ,সৈয়দ (সংকলন ও সম্পাদনা), রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরা, কারিগর ,কলকাতা, ২০১৫।

৫৪. সেনগুপ্ত ,শংকর (অনুবাদ), দি রিলিজিয়ন অফ ম্যান (মূল হিবার্ট বক্তৃতামালা থেকে নির্বাচিত অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ), প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স,কলকাতা, ২০০৮।

৫৫. বসু,শ্যামাপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ ও সাত ব্যক্তিত্ব ,দে জ পাবলিশিং ,কলকাতা, ২০১৪।

৫৬. ঘোষ ,অভ্র ,শিক্ষাচিন্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১),কারিগর,কলকাতা,২০১৭।

৫৭. অবধূত কালিকানন্দ ,উপনিষদ সমগ্র ,গিরিজা লাইব্রেরি , কলকাতা ,১৪২৭।

৫৮. বসু,যোগীরাজ,উপনিষদের ভাবাদর্শ ও সাধনা ,বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ২০১৭।

৫৯. ব্রহ্মচারী ,সুখেনলাল ,শিশুর মন ,বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪১৯।

৬০. বন্দ্যোপাধ্যায় ,অর্চনা,শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতি ,বি. বি. কুন্ড গ্রান্ড সন্স, কলকাতা,২০১৩।

৬১. ঘোষ, অরুণ, শিক্ষাবিজ্ঞানের দর্শন ও মূলতত্ত্ব ,এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স, কলকাতা, ২০১৬।

৬২. সনাতনানন্দ, স্বামী, শিক্ষা ও শিক্ষক, সূর্য পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৯।

৬৩. আচার্য ,পরমেশ, বাঙালির শিক্ষাচিন্তা , দে জ পাবলিশিং , কলকাতা, ১৪১৮।

৬৪. বাংলা দ্বিতীয় সংখ্যা , বিশ্বভারতী , কলকাতা, ২০০৭।

৬৫. বসু, নন্দলাল, শিল্প কথা , বিশ্বভারতী ,কলকাতা, ১৪০৭।

৬৬. কৃষ্ণমূর্তি, জে, ব্যানার্জী, শ্রী প্রবীর কুমার (অনুবাদক), তুমি পড়াশোনা কেন করছো?, কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা, ২০২০।

৬৭. কৃষ্ণমূর্তি, জে, পাহাড়ী, অঞ্জন (অনুবাদক), ভাববার কথা ,কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া,কলকাতা , ২০১২।

৬৮. কৃষ্ণমূর্তি,জে,ব্যানার্জী, শ্রী প্রবীর কুমার (অনুবাদক), প্রথম এবং শেষ স্বাধীনতা, কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া ,কলকাতা , ২০১৬।

৬৯. কৃষ্ণমূর্তি, জে,ব্যানার্জী,শ্রী প্রবীর কুমার (অনুবাদক), কাল এবং কালের অতীত, কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া ,কলকাতা , ২০১৫।

৭০. মার্ক লী, আর ই,ব্যানার্জী, শ্রী প্রবীর কুমার (অনুবাদক), বিশ্ব শিক্ষক (The Life And Teachings Of J. Krishnamurti গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ), সুচেতনা, কলকাতা, ২০২১।

৭১. Tagore, Rabindranath, the religion of man, Visva Bharati, Kolkata, *2015.*

৭২. Tagore ,Rabindranath, Personality, Rupa, New Delhi, *2019.*

৭৩. Tagore, Rabindranath, Sadhana, Rupa. Co., New Delhi, *2005.*

৭৪. Tagore, Rabindranath, Angel of Surplus (Ed. Sisirkumar Ghose), Visva Bharati, Kolkata, *2010.*

৭৫. Roy, Kshitis (Ed.), Education Number VOL. XIII Parts I & II, Visva Bharati, *2004.*

৭৬. Tagore, Rabindranath, On Art & Aesthetics (A selection of Lectures, Essays & Letters), Subarnarekha, Kolkata, *2005.*

৭৭. Tagore, Rabindranath, The Religion of an Artist, Visva Bharati, Kolkata, *1963.*

৭৮. Roy (Neogi), Kamalika, Essentialism and Freedom In Tagore's of Art, Thesis awarded to the J.U. for the degree of Doctor of Philosophy, *2002.*

৭৯. Krishnamurti, J., On Education, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2018.*

৮০. Krishnamurti, J., Education and The Significance of Life, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2014.*

৮১. Krishnamurti, J., Life Ahead, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2014.*

৮২. Krishnamurti, J., Why are you Being Educated? Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2018.*

৮৩. Krishnamurti, J., What Are You Doing With Your Life? Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2019.*

೮೫. Krishnamurti, J., Beginnings Of Learning, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2017.*

೮೮. Krishnamurti, J., School Without Fear, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2018.*

೮೮. Krishnamurti, J., On Fear, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2021.*

೮೯. Krishnamurti, J., On Conflict, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2017.*

೯೦. Krishnamurti, J., Talks with Students Varanasi *1954* (the collected works of J. Krishnamurti, VOL. VIII), Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2012.*

೯೧. Krishnamurti, J., In The Problem Is The Solution (Questions And Answers Meeting In India), Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2008.*

೯೨. Krishnamurti, J., Questions And Answers, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2019.*

೯೩. Krishnamurti, J., To Parents And Teachers, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2019.*

೯೪. Krishnamurti, J., Freedom from the Known, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *1999.*

೯೫. Krishnamurti, J., The First and Last Freedom, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2020.*

೨೫. Krishnamurti, J., On Freedom, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2017.*

೨೮. Krishnamurti, J., Freedom Responsibility and Discipline, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2019.*

೨೮. Krishnamurti, J., Leaving School Entering Life Talk and Dialogues with Students, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2019.*

೨೯. Krishnamurti, J., The Awakening Of Intelligence, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2020.*

೨೮. Krishnamurti, J., The Flame Of Attention, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2019.*

೨೨. Krishnamurti, J., Beyond Violence, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2012.*

೨೦೦. Krishnamurti, J., A Wholly Different Way Of Living, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2018.*

೨೦೨. Krishnamurti, J., Selections From The Decades *40*s On Self Knowledge, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2019.*

೨೦೨. Krishnamurti, J., Rajagopal, D(ed.), Think On These Things, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2021.*

೨೦೮. Krishnamurti, J, Skitt, David, (ed.), Facing A World In Crisis What Life Teaches Us In Challenging Times, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2017.*

১০৪. Krishnamurti, J, Krishnamurti, K. (ed.), A Door Open For Anyone, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2019.*

১০৫. Krishnamurti, K.(ed.), Krishnamurti For Beginners and Anthology, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2016.*

১০৬. McCoy,Ray. (ed.), J Krishnamurti's Letters To His School The Whole Moment Of Life Is Learning , Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2019.*

১০৭. Mark Lee, R., E., World Teacher The Life And Teachings Of J Krishnamurti, Hay House Publishers, Delhi, *2020.*

১০৮. Krishnamurti, J., Meditation, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2009.*

১০৯. Krishnamurti, J., Educating The Educator, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2022*

১১০. Krishnamurti, J., Happy Is The Man Who Is Nothing Letters To A Young Friend, Krishnamurti Foundation India, Chennai, *2022.*

১১১. Sykes, Marjorie, Education in Search of a Philosophy, Earthcare Books , Mumbai, *2010.*

১১২. Ahmad, Sufian, Sinha, Biswajit (Ed.), An Inventory of Tagore Literature, Sahitya Akademi, New Delhi, *2014.*

১১৩. Chaube, S.P., Recent Philosophies of Education On India, Concept Publishing Company, New Delhi, *2005.*

১১৪. MacCarthaigh, Brendan, Bhattacharyya, Sonia, Where the Teacher is at Ease, Earthcare Books, Kolkata, *2012.*

১১৫. MacCarthaigh, Brendan, Where the Child Is Without Fear, Earthcare Books, Kolkata, *2011.*

১১৬. Ozmon,Howard A, Craver,Samuel M, Philosophical Foundation of Education, Merrill, New Jersey, 1995.

১১৭. O'Connell, Kathleen M., Rabindranath Tagore The Poet as Educator, Visva Bharati, Kolkata,*2012.*

১১৮. Radhakrishnan, S., The Philosophy of Rabindranath Tagore, Companion Publishers, Boroda, *1961.*

১১৯. Maitra, SisirKumar, Rabindranath and The Philosophy of Personality, The Golden Book of Tagore, Publisher Ramananda Chatterjee, *1931* .

১২০. Das, Sisirkumar (Ed.), The English Writing of Rabindranath Tagore VOL. III, Sahitya Akademi, New Delhi, *1996.*

১২১. Pathak, Avijit, Education and Moral Quest, Aakar Books, Delhi, *2009.*

Jhuma Chakraborty
29.12.22.

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Pampa Ray
29.12.2022